শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম্-এ, বি-এল,

প্রণীত

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

সংস্করণ

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩]

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

প্রিণ্টার—এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

দেশ-মাতৃকার পূজা—মহাব্রত জীবনের মাঝে
বরণ করিল যারা ; পরাধীন মাতৃভূমি হেরি'
হৃদয়-তন্ত্রীতে যার অশরীরী মহাধ্বনি বাজে ;
অত্যাচার-উৎপীড়ন করে জয় বাজাইয়া ভেরী ;
দেশে দেশে যুগে যুগে করে দান শোণিতের ধারা,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা মহাক্লেশ হেলায় সহিল অনিবার ;
মহানন্দে কারাগারে বরণ করিয়া নিল যারা ;—
দিলাম তাদের করে 'নেতাজী সুভাষ' আমার।
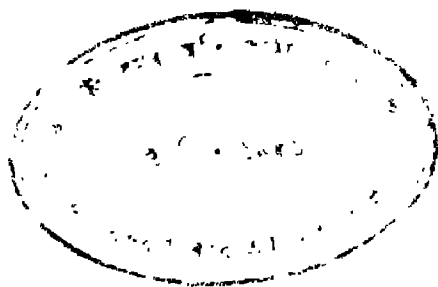
গ্রন্থকারের নিবেদন

বাংলার তথা ভারতের গৃহে গৃহে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম আজ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, অলৌকিক স্বার্থত্যাগ, অভূতপূর্ব তেজস্বিতা, অদ্বিতীয় সঙ্ঘগঠন-শক্তি, সর্ব্বোপরি নির্ম্মল মন্দাকিনী-ধারার মত তাঁহার অকৃত্রিম অনাবিল স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে ছোট-বড় সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

হইতে পারে তিনি জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহার জীবন-ব্যাপী প্রচেষ্টা রাণা প্রতাপের মত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে, সন্দেহ নাই।

তাঁহার জীবন বিফলতায় পর্য্যবসিত হইলেও তাঁহার মহৎজীবনে শিক্ষার অনেক কিছু আছে। তাই বাংলা-মায়ের অঞ্চলের নিধি সুভাষচন্দ্রের জীবন-কাহিনী প্রণয়নে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি বহুস্থানে "কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, সুভাষ-সংখ্যা"র সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন সাময়িক পত্রিকা, সংবাদ-পত্র, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত "দেশবন্ধু-স্মৃতি", অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত "বিনয় সরকারের বৈঠকে", সুভাষবাবুর নিজের রচনা "স্বদেশী ও বয়কট" (ইংরেজী) হইতেও অনেক সাহায্য গ্রহণ

করিয়াছি। তজ্জন্য উপরিলিখিত পুস্তক ও পত্রিকার লেখক ও সম্পাদকগণকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে "দেব সাহিত্য-কুটীরের" স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিলে আমার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কারণ তিনিই সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন-চরিত প্রণয়নে আমাকে উৎসাহিত এবং সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ এবং সাহায্য না পাইলে স্বদেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কীর্ত্তি-কাহিনী লেখনীমুখে প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ।

মঙ্গলময় ভগবান্ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মাকে শান্তিদান করুন।

১১ বি, শম্ভুবাবু লেন,
কলিকাতা
দোল-পূর্ণিমা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন মহাশয় যখন "নেতাজী সুভাষচন্দ্র' লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন পর্য্যন্ত এই বিরাট পুরুষটির সব কথা ও তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তির অনেক-কিছু সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। কাজেই মাত্র এক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানোর আগে বইখানি আবার নূতন ভাবে পরিমার্জ্জনের প্রয়োজন মনে হয়। দেব সাহিত্য-কুটীরের কর্ণধার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সে দায়িত্ব আমারই কাঁধে চাপাইয়া দেন।

এই দায়িত্ব আমার পক্ষে অতি কষ্টকর হইলেও আমি তাহা যথাসাধ্য বহন করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে বিচার করিবেন আমার পাঠক-পাঠিকাগণ। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

আমার কলম-চালনা ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে পুস্তকের গৌরব যদি কোথাও ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, অথবা কাহারও আপত্তিকর কিছু ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেজন্য দায়ী এই নগণ্য সম্পাদক,—মূল গ্রন্থকার হেমেন্দ্রবিজয় বাবু একেবারেই দায়ী নহেন। ইতি—

কলিকাতা
১১নং কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

সূচীপত্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

এক

বাল্য-জীবন

জন্ম—মাতাপিতা—প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ।

বাংলার সুসন্তান, দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক অলোক-সামান্য ত্যাগী, সুখে-দুঃখে নিঃস্পৃহ, বাঙ্গালী বীর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী মহানদীর তীরবর্ত্তী কটক সহরে স্বর্গচ্যুত মন্দার-কুসুমের মত ধূলি-মলিন ধরণী-বক্ষে এক শুভ মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম সূর্য্যালোককে অভিনন্দিত করেন।

এই দিন যে নবীন জ্যোতিষ্ক ভারতের ভাগ্য-গগনে সমুদিত হইল, তাহার বিমল দ্যুতি আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ বিকীর্ণ, এবং তাহার প্রভাবে, আজ শুধু আসমুদ্র-হিমাচল নহে, প্রতীচির শ্বেতদ্বীপ পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে!

সুভাষচন্দ্রের পিতার নাম জানকীনাথ বসু এবং মাতার নাম প্রভাবতী বসু। বসু-পরিবারের আদি নিবাস জেলা চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। জানকীনাথ

বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া সুদূর কটকে ব্যবহারাজীবের কার্য্যে যোগদান করেন। এই স্থানে ভাগ্যলক্ষ্মীর অপার করুণা তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে থাকে। ধীরে-ধীরে তিনি স্থানীয় উকিলগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বার-লাইব্রেরীর নেতৃত্ব এবং গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দ্বারা সমলঙ্কৃত করেন।

জানকীনাথ নিজে যেরূপ বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তিনি স্বীয় পুত্রগণকেও অনুরূপভাবে শিক্ষিত করিবার প্রয়াস পান। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে উপার্জ্জিত বিপুল অর্থ তিনি পুত্রগণের সুশিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার আটটি পুত্র এবং ছয়টি কন্যার মধ্যে দুইটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন; অবশিষ্ট ছয়টি পুত্রের নাম—সতীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র এবং সুভাষচন্দ্র।

জানকীনাথ পুত্রগণের প্রত্যেককে শিক্ষাদানের জন্য ইয়োরোপে পাঠাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন,—পাশ্চাত্ত্য শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষা আয়ত্ত করিতে না পারিলে, এবং যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমান জগতে প্রভাব বিস্তার করিয়া বড় হইয়াছে তাহাদের সংস্পর্শে না আসিলে, জগতের বুকে মানুষের মত দাঁড়ান সম্ভব নহে।

জানকীনাথের ইচ্ছা আজ পরিপূর্ণ হইয়াছে—তাঁহার সকল পুত্রই কৃতবিদ্য; তন্মধ্যে দুই পুত্র—সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের

যশোরশ্মি সূর্য্য ও পূর্ণচন্দ্রের মত ভারতাকাশ চির-দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত রাখিবে।

জানকীনাথ নিজে অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং গভর্ণমেণ্টের উপাধিধারী হইলেও তিনি কোন দিন গভর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিতে পারেন নাই। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় গভর্ণমেণ্ট যখন প্রচণ্ডভাবে দমন-নীতির প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তেজস্বী জানকীনাথ গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ "রায় বাহাদুর" উপাধি বর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পিতার এই তেজস্বিতা এবং স্বাধীনচিত্ততা পুত্র সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণভাবে সংক্রমিত হইয়াছিল।

জানকীনাথ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতীও সর্ব্বাংশে স্বামীর অনুরূপ ছিলেন। তাঁহার অসামান্য দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি চারিত্রিক সদ্‌গুণরাজি তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের—বিশেষতঃ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সমুজ্জ্বলভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি আদর্শ হিন্দু রমণী ছিলেন; কিন্তু সুশিক্ষার জন্য পুত্র-কন্যাগণের ইয়োরোপ গমনে কখনও বাধা প্রদান করেন নাই। দীন-দরিদ্রের দুঃখ-দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত এবং তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্তে তাহাদের দুঃখ-মোচনে নিরত থাকিতেন। পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে মাতার এই পরদুঃখ-কাতরতাও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আত্ম-বিকাশ করিয়াছিল।

বিগত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতী দেবী ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে হিন্দুর চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্র কটকের প্রটেষ্টাণ্ট ইয়োরোপীয়ান্ স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ে তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের বাল্য-জীবনের এই ছয়-সাত বৎসর, সমগ্র জীবনের অতি সামান্য অংশ হইলেও, চরিত্র-গঠনে ইহা তাঁহাকে নিতান্ত কম সাহায্য করে নাই! পাশ্চাত্ত্য মানব-চরিত্রের দোষ-গুণ তিনি অতি মনোযোগের সঙ্গেই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন! পাশ্চাত্ত্যের সজীবতা ও নিজেদের জড়তা তিনি নিজের অন্তরে অনুভব করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেন! আর সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দুর্ব্বলতা, গ্লানি ও অপমান এক মুহূর্ত্তে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সিংহ-বিক্রমে জগতে দণ্ডায়মান হইবার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেন! আর তখন হইতেই কি এক দৃঢ় সঙ্কল্পের নির্ম্মম গুরুভার তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুপ্ত ভাবরাশিকে মহানদীর তরঙ্গ-কল্লোলে প্রতিধ্বনিত করিয়া, তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিত!

সুভাষচন্দ্র বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল ছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগও বাল্যকাল হইতেই পরিলক্ষিত হইত। লেখাপড়ার জন্য তাঁহাকে কোনদিন কোনরূপ তাড়না করিতে হয় নাই। স্বাভাবিক সংস্কার-বশেই যেন তিনি পাঠ্য পুস্তক লইয়া বসিতেন!

দীন-দরিদ্রের দুঃখ-মোচনের আন্তরিক ইচ্ছা, আর্ত্তের পরিত্রাণ-কামনা, রোগীর রোগ-শয্যায় শুশ্রূষা করিবার অভিলাষ, মোট কথা, সমগ্রভাবে জনসাধারণের তথা জননী জন্মভূমির সেবার আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার অন্তরলোকে বিকশিত হইয়া উঠিত ; কিন্তু তখনও তাহার বাহ্য-বিকাশ তেমন দেখা যাইত না। এক কথায় বলা চলে—তাঁহার বৃহত্তর জীবনের ছায়া যেন সেই বাল্য-জীবনেই প্রতিফলিত হইয়া উঠিত ! এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে পাশ্চাত্ত্য অন্ধ মহাকবির অমর বাণী—

"Childhood shows the man,
As morning shows the day."

দুই

বিদ্যার্থি-জীবন

র‍্যাভেন্‌শা কলেজিয়েট স্কুলে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব—বেণীমাধব দাসের প্রভাব—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা—ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য—তেজস্বিতার প্রথম বিকাশ—বি. এ. উপাধি লাভ—আই. সি. এস্.—কেম্ব্রিজের বি. এ.।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সুভাষচন্দ্রকে প্রটেষ্টাণ্ট ইয়োরোপীয়ান স্কুল হইতে লইয়া আসিয়া র‍্যাভেন্‌শা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। বর্ষার বারিধারা-সম্পাতে সুপ্ত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, এইবার সময় এবং সুযোগের প্রভাবে সুভাষচন্দ্রের মনোজগতে সেইরূপ সুপ্ত বৃত্তিসমূহ জাগিয়া উঠিল :

এতদিন ইয়োরোপীয় স্কুলে বিদ্যাভ্যাসে নিরত থাকায়, ঠিক জাতীয় ধর্ম্মভাবের প্রেরণা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। র‍্যাভেন্‌শা কলেজিয়েট স্কুলে আসিবার পর হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সুমধুর উপদেশাবলীর সহিত তিনি পরিচিত হইতে আরম্ভ করেন ; সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রধান শিষ্য ও বাণী-প্রচারক ভারতের অন্যতম গৌরব ও দেশ-মাতৃকার অন্যতম সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যাবলী তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিতে আরম্ভ করে।

চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ যেমন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত রামকৃষ্ণ-মিশনের সেবা-কার্য্যের দিকে কিশোর সুভাষচন্দ্রও ঢলিয়া পড়িলেন। যখন তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেন, তখনই তিনি রোগীর শুশ্রূষায়, দুঃখীর দুঃখ-মোচনে এবং দরিদ্রের সেবায় দিবসের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিতেন।

এই সময় কটক র‍্যাভেন্‌শা কলেজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এম্, এ.। ইনি পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট্ স্কুল হইতেই পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন।

ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। ইঁহার কন্যা শ্রীমতী বীণা দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে গুলি করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস মহাশয় সুশিক্ষক বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার এবং ছাত্রগণের প্রতি সস্নেহ আচরণ তাঁহাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কাহারও কোনরূপ দোষ-ত্রুটি দেখিলে তিনি প্রথমে মিস্ট ব্যবহারে তাহা সংশোধনের প্রয়াস পাইতেন। উহাতে কোনরূপ ফল না হইলে পরে শৃঙ্খলা-রক্ষার্থ কঠোরতা অবলম্বনেও দ্বিধা-বোধ করিতেন না।

গুরুর এই দুইটি সদ্‌গুণ—কোমল ও কঠোরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ—শিষ্য সুভাষচন্দ্রে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মহাকবি ভবভূতির ভাষায় বলা যায়, তিনি ছিলেন--

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥"

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কটক র‍্যাভেন্‌শা কলেজিয়েট স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রদান করেন। এই পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। এইবার মহানদীর তীর হইতে বাসভূমি জাহ্নবীর তীরে পরিবর্ত্তিত হইল—কটক ত্যাগ করিয়া তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতা আগমন করিলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এ. পড়িবার সময় স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনিও তাঁহার বুকের মাঝে কি এক নিদারুণ অশান্তি ও অতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন! কণ্টক-শয্যায় যাঁহার ভবিষ্যৎ বিশ্রাম, তিনি কি কখনও ধনীর দুলালের ন্যায় তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? শীঘ্রই তাঁহার মনোজগতে এক ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য উপস্থিত হইল। বাহ্যজগতে পার্থিব বিষয়ে উন্নতি অপেক্ষা আত্মার মুক্তি উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। গৃহে বাস তাঁহার নিকট বন্ধনরূপে দেখা দিল।

যে রহস্য মীমাংসার জন্য বুদ্ধদেব একদিন রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু সাজিয়াছিলেন, যে ভূমানন্দের প্রত্যাশায়

নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি, সুন্দরী স্ত্রী, স্নেহশীলা জননী প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া নীলাচলের পথে-পথে গাহিয়া বেড়াইতেন—

"ন ধনং, ন জনং, ন সুন্দরীং, কবিতাং বা জগদীশং কাময়ে"—

সুভাষচন্দ্রের প্রাণেও সে রহস্য-মীমাংসার চিন্তা সমুদিত হইল, সে ভূমানন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইল।

তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না—আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতসারে সদ্‌গুরু লাভ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া জটাজূট-বিমণ্ডিত বিভূতি-ভূষিত সন্ন্যাসি-মহলে তিনি সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে বুদ্ধ, চৈতন্য, কবির, নানক, তুলসীদাস, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের পদধূলি-বিরঞ্জিত ক্ষুণ্ণ মার্গে বিচরণ করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই—তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পর-পদানতা শৃঙ্খলিতা স্বদেশ-জননী যেন মলিন-বদনে তাঁহারই মুখের দিকে কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া ছিলেন! সেই জন্য তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়াও ঠিক মনের মত গুরুর দর্শন পাইলেন না। সুতরাং তিনি গৃহে ফিরিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় আবার পাঠ্য পুস্তকে মনঃসংযোগ করিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং দর্শন শাস্ত্রে অনার্স লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজেই বি. এ. পড়িতে থাকেন।

সুভাষচন্দ্র যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তৎকালে ই. এফ্. ওটেন মহোদয় প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন * এবং এইচ্. আর. জেম্‌স্ ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। ই. এফ্. ওটেন মহোদয় পরে বাংলার ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্-এর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মিঃ ওটেন অনেক সময় ভারতীয় ছাত্রদের মনোবৃত্তি আহত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে সুভাষচন্দ্র জীবনে প্রথম শাসকজাতির গর্ব্ব এবং ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহার জীবনে এই প্রথম পুঁথিগত নীতি ও পুঁথিগত স্বদেশপ্রেম কর্ম্মক্ষেত্রে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইল; এবং যখন তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।†

অধ্যাপক মিঃ ওটেনকে প্রহার করার অভিযোগে সুভাষচন্দ্র অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। পরে শিক্ষাব্রতী পুরুষসিংহ স্যার

* দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে ই. এফ্. ওটেনকে প্রিন্সিপ্যাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা ভ্রমাত্মক।

† "Prof. Oaten was said to have wounded the feelings of the Indian Students and Subhash Chandra, for the first time in his life, made a bold stand against the pride and arrogance of the ruling class and it was the first occasion in his life when his 'theoretical morality and theoretical patriotism were put to a trial and a very severe test'; and when he came out of the ordeal unscathed, his 'future career had been chalked out once for all.'"
—*The Calcutta Municipal Gazette*, Vol XLII, No. 16, P. 442 (*a*)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে অবহিত হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আবার অধ্যয়ন করিবার অনুমতি লাভ করিলেন।

সুভাষচন্দ্র এবার আর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন না, তিনি স্কটিশ-চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দর্শন-শাস্ত্রের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে এম্. এ. পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সুভাষচন্দ্রের সমগ্র পরিবারই উচ্চ-শিক্ষিত। সুতরাং তাঁহারা সুভাষচন্দ্রের ন্যায় মেধাবী ছাত্রকে বাঙ্গালী জীবনের ইন্দ্রত্ব করিবার উদ্দেশ্যে, আই. সি. এস্. পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতে আদেশ করেন।

সুভাষচন্দ্র অভিভাবকের আদেশ কোন দিনই লঙ্ঘন করেন নাই; রণক্ষেত্রের সৈনিকের মত তিনি ঊর্দ্ধতন ব্যক্তির আদেশ চিরকালই অবনত মস্তকে পালন করিতেন। সুতরাং অভিভাবকের সন্তোষ-বিধানার্থ তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা প্রদানার্থ ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডে উপনীত হইবার আট মাস পরে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদান করেন এবং গুণানুসারে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। মাত্র আট মাস পড়িয়া এইরূপ কঠিন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় এতাদৃশ কৃতিত্ব-প্রদর্শন সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

কিন্তু আই. সি. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও সুভাষচন্দ্র অন্তরে-অন্তরে ঠিক আত্ম-প্রসাদ লাভে সমর্থ হন নাই। সেইজন্য তিনি পুনরায় মনো-বিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞানে ট্রাইপোজসহ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অনতিবিলম্বে উক্ত বিষয়ে ট্রাইপোজসহ বি. এ. উপাধি লাভ করিলেন।

এইখানেই ব্যবহারিক ভাবে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের একটি অঙ্কে যবনিকা নিপতিত হয়।

তিন

কর্ম্ম-জীবন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাহচর্য্য

আই. সি. এস্. পদত্যাগ—ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন—অসহযোগ-আন্দোলন—কলিকাতায় হরতাল—গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড—বন্যা-পীড়িতদের সেবা—কংগ্রেসের গয়া-অধিবেশনে—'বাংলার কথা' ও 'ফরওয়ার্ড'—কলিকাতা কর্পোরেশনে—অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার—মান্দালয়ে নির্ব্বাসন—দেশবন্ধুর মৃত্যু—মুক্তিলাভ।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির নাগপুর-অধিবেশনে অসহযোগ-আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সমগ্র ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী এবং চট্টগ্রাম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত অসহযোগ-আন্দোলনের হোমানলে আত্মাহুতি প্রদানে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এই আন্দোলনের বিরাট্ তরঙ্গ সুদূর সাগর-পারে ইংলণ্ডে অবস্থিত সুভাষচন্দ্রের চিত্ত-বীণায়ও আঘাত করিল। নবীন সঙ্কল্প, নবীন উৎসাহ, নবীন আশার বাণী তাঁহার অন্তর-লোকে নবারুণ-রাগে ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও অসহযোগ-আন্দোলনের হোমানলে আত্মাহুতি দিতে কৃতসঙ্কল্প

হইয়া উঠিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া আই. সি. এস্.-পদে ইস্তফা-পত্র দাখিল করিলেন।

তৎকালীন ভারত-সচিব মণ্টেগু তাঁহাকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। আবাল্য যে অতৃপ্তির পীড়ন তিনি মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন, পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়া তিনি যেন তাহা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিলেন! দেশ-মাতৃকার করুণ মুখমণ্ডল তাঁহার অন্তর-মধ্যে যেন স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। তিনি দেশসেবার কঠোর ব্রত গ্রহণে সঙ্কল্প করিলেন।

সুভাষচন্দ্র ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেশবন্ধুও তাঁহাকে অসহযোগ-আন্দোলনের কর্ম্মিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন এবং সর্ব্বকার্য্যে স্বীয় দক্ষিণহস্তস্বরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"জুলাই-আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াও বাঙালী জীবনের ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিয়া সেবাব্রত লইয়া দেশবন্ধুর সঙ্গে মাতৃভূমির সেবাকল্পে আত্মোৎসর্গ করেন। এই অকৃত্রিম

তেজস্বী ধীমান্ কর্ম্মীটিকে পাইয়া দেশবন্ধুর আনন্দের অবধি ছিল না। * * * * স্বরাজ-সাধনায় সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা জাতীয় ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করিল।" —দেশবন্ধু-স্মৃতি, পৃঃ ২৮১

সুভাষচন্দ্র প্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ বা গৌড়ীয় সর্ব্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদে কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির পাবলিসিটি অফিসার বা প্রচারাধ্যক্ষের কার্য্যভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইল। অতঃপর তিনি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর ক্যাপ্টেন বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ সামরিক জীবনের উন্মাদনা ও মর্য্যাদা জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম তিনি উপলব্ধি করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর মহামান্য প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ মহোদয় ভারত-পরিদর্শনার্থ বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করেন। গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জ্জনের নিদর্শন-স্বরূপ কংগ্রেসের পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে ঐ দিন ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায়ও এই হরতাল পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয়। সুভাষচন্দ্র এই হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"ষ্টেশন হইতে সুভাষচন্দ্র গাড়ীর উপরে বসিয়া স্ত্রীলোকদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিতেছিলেন এবং বাহিরে লেখা ছিল 'On National Service'—অর্থাৎ 'জাতীয় সেবাব্রতে'। কোনও যান চলে নাই ; বাইসিকেল পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল।" —দেশবন্ধু-স্মৃতি, পৃঃ ২৭

সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে হরতাল সাফল্যমণ্ডিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অতি নির্ম্মমভাবে সরকারী দমন-নীতির সূত্রপাত হইল।

ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না, ইহা অপ্রত্যাশিতও নহে। কারণ, মহামান্য ভারত-সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-বিধাতাকে যাঁহারা অবহেলায় অপাংক্তেয় করিতে সাহসী হন, চরম রাজরোষ যে তাঁহাদের মস্তকে বজ্রের আকারে পতিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহের কি আছে?

হরতালের একদিন পরে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯শে নভেম্বর তারিখে কংগ্রেস ও খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং এই উভয় আন্দোলনকে নিষ্ক্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক কংগ্রেস ও খিলাফৎ-অফিসে ধারাবাহিকভাবে খানা-তল্লাসী চলিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদে কলিকাতার জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্ম্মিগণের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস-কমিটির সমস্ত সভ্যকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করা হইল।

এই সম্পর্কে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র বসু বিনাশ্রমে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

(১৯২০ সালে, লণ্ডনে)—উপবিষ্ট ডাঃ সুনীল বসু ও সতীশচন্দ্র বসু
দণ্ডায়মান—রণেন দত্ত (সুভাষচন্দ্রের মাতুল) ও সুভাষচন্দ্র।

এই কারাজীবন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র নিজে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"১৯২১ ও ১৯২২ সালে দেশবন্ধুর সহিত আট (?) মাস কাল কারাগারে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল; তন্মধ্যে দুইমাস কাল আমরা পাশাপাশি সেলে প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ছয় মাস কাল আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের একটি বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার (দেশবন্ধুর) সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েকমাস তাঁহার একবেলার রান্নাও আমাদিগকে করিতে হইত, গভর্ণমেণ্টের কৃপায় আমি যে আট মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছিলাম,—ইহা আমার পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়।"

—দেশবন্ধু-স্মৃতি, পৃঃ ৫৪৯

১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করেন। তখন ভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধানে ভীষণ বন্যায় উত্তর-বঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে! অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন সহস্র সহস্র নরনারীর আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহাতে স্বভাব-করুণ সুভাষচন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন।

তিনি স্বয়ং উত্তর-বঙ্গে গমন করিয়া বন্যা-পীড়িতদের দুঃখ-দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং বেঙ্গল রিলিফ-কমিটির সেক্রেটারীরূপে যেরূপ শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থায় বন্যা-পীড়িত নর-নারীর সেবার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও গঠন-প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সমভিব্যাহারে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের গয়া-অধিবেশনে যোগদানার্থ গমন করেন। এই অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের মুখোশ খুলিয়া দেখাইবার প্রস্তাব করিলে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাবে দেশবন্ধুর পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের পর ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গয়া, টিকারীর রাজবাড়ীতে দেশবন্ধু কংগ্রেস-খিলাফৎ-স্বরাজ পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও এলাহাবাদের অধিবেশনে এই দলের নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া "স্বরাজ্য-দল" করা হয়।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কাউন্সিল প্রবেশের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইলেন। এই ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ হইয়া 'স্বরাজ্য-দল' গঠনে ও নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়যুক্ত হইবার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করেন। এই পরিশ্রমের ফলে স্বরাজ্যপার্টির ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত হইল।

এই সময় সুভাষচন্দ্র 'বাংলার কথা' নামক একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। পরে স্বরাজ্য-দলের মুখপত্ররূপে দেশবন্ধু যখন ইংরাজী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা বাহির করিলেন, তখন সুভাষচন্দ্র প্রচার-সচিব নিযুক্ত হন। প্রচার-সচিবরূপে তিনি পত্রিকার জন্য কিরূপভাবে কাজ

করিতেন, তাহা অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

"তখন সুইটজারল্যাণ্ডে ছিলাম। লুগানো সহরে বা পল্লীতে হঠাৎ সুভাষ বসুর টেলিগ্রাম পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি। চিত্তরঞ্জনের 'ফরওয়ার্ড' দৈনিক তখন সবে বেরিয়েছে বা বেরোয় বেরোয় হয়েছে। ১৯২৩ সন, * * * ফরওয়ার্ডের জন্য এই অধমকে 'বিদেশী সংবাদ-দাতা' বহাল করা হয়েছিল। আমার উপর ভার ছিল ফরাসী, ইতালিয়ান, আর জার্ম্মাণ ভাষায় প্রচারিত বিশ্ব-সংবাদ টেলিগ্রাফে ফরওয়ার্ডকে পাঠাবার। চিঠিতে লেখা ছিল, রয়টারকে হারাতে হবে।'—এই কথাটায় খুব খুশী হয়েছিলাম।" —বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৩-৪৪

এইভাবে অবিরাম পরিশ্রম করিয়া তিনি ফরওয়ার্ড দৈনিককে শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকারূপে জন-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি দীর্ঘকাল ফরওয়ার্ডের সেবা করিবার সুযোগ পান নাই।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বঙ্গীয় "স্বরাজ্য দল" কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকার করিল। বত্রিশটি ওয়ার্ডে দেশবন্ধুর মনোনীত ব্যক্তি কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্ব্বপ্রথম মেয়র হন। ইহাতে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্ম্ম-ব্যবস্থায় যুগান্তর সংসাধিত হয় এবং সুভাষচন্দ্র বসু কর্পোরেশনের সংশ্রবে আসেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল সুভাষচন্দ্র মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম চীফ্ এক্সিকিউটিভ

অফিসার নিযুক্ত হইলেন। এই পদের সাধারণ বেতন মাসিক ৩০০০৲ টাকা, কিন্তু সুভাষচন্দ্র অর্দ্ধেক বেতন মাত্র গ্রহণ করিতেন।

দেশবন্ধুর শত্রুরা এই সময় কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলে, দেশবন্ধু অগাধ বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন—

"সব কাজ লোকসান করে সুভাষকে দিয়েছি, একটু সময় দিন; সবই হবে।"—দেশবন্ধু-স্মৃতি, পৃঃ ৩৫১

সুভাষচন্দ্রকে দেশবন্ধু যে কতটা বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন, এই সামান্য একটি কথায়ই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতায় কর্পোরেশনে এক নূতন জীবনের সঞ্চার হইল। যে কর্পোরেশন এতকাল পাশ্চাত্য ভাবধারায় লালিত-পালিত হইতেছিল, সহসা তাহাতে জাতীয় ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হইল। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী ও সভ্যগণ সুচিক্কণ বিদেশী সাজসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অমসৃণ খদ্দরে দেহ শোভিত করিয়া আফিসে আসিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট বিদেশী পোষাকের অপেক্ষা খদ্দরের সম্মান এই সর্ব্বপ্রথম পৌরসভায় স্বীকৃত হইল।

এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের কল্যাণের দিকেও সুভাষচন্দ্রের মনোযোগ নিতান্ত কম ছিল না! সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াই নাগরিকদিগকে বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষা ও ঔষধ-পথ্য পাইবার সুযোগ দান করিলেন। হয়তো তাহাদিগকে আরও অনেক সুবিধাই দেওয়া হইত, কিন্তু

সহসা তাহাতে এক বিঘ্ন আসিয়া পড়িল। কর্পোরেশনের উন্নতিমূলক কার্য্যে তিনি আর বেশীদিন আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেন না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন-সংশোধন অর্ডিন্যান্স অনুসারে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হইল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"গর্ব্বিত ধনবানের হস্ত হইতে সমবেদনাময় সেবক-সম্প্রদায়ের হস্তেই কর্পোরেশন আসিয়া পড়িত; গরিবের সেবা হইত, মাছ দুগ্ধ খাইয়া কলিকাতার লোক বাঁচিত, বিষাক্ত তৈল ও ঘৃতের সহায়তায় ডিস্‌পেপ্‌সিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিত না, কিন্তু সব বিফল হইল! সুভাষচন্দ্র অমাত্য-তন্ত্রের কবলে নিপতিত হইলেন।"
—দেশবন্ধু-স্মৃতি, পৃঃ ৩৫১

সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে সমগ্র দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করায় কলিকাতা কর্পোরেশনের ২৯শে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতার মেয়র-রূপে নিম্নলিখিত ভাষায় গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন—

"স্বদেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, তবে আমিও অপরাধী। যদি সুভাষচন্দ্র বসু অপরাধী হন, তবে আমিও অপরাধী—কর্পোরেশনের শুধু প্রধান কর্ম্ম-সচিব নহে, মেয়রও সমভাবে অপরাধী।" *

* "If love of country is crime, I am a criminal. If Mr. Subhas Chandra Bose is a criminal,—I am a criminal,—not only the Chief Executive Officer of the Corporation, but the Mayor of this Corporation is equally guilty."
—*The Calcutta Municipal Gazette*, Vol. XLII, No. 16, P. 442.

সুভাষচন্দ্রই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা প্রকাশের পূর্ব্বেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুতরাং তিনি উহার প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত মন্তব্য স্থান পাইয়াছিল—

"প্রধান কর্ম্ম-সচিবের গ্রেপ্তারে কর্পোরেশন কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, যাহারা ইহার বহির্ভাগে অবস্থিত তাহাদের পক্ষে তাহা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। * * * শ্রীযুক্ত বসু কর্পোরেশনের শুধু কর্ম্ম-সচিব ছিলেন না; তিনি ছিলেন প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কার্য্যের বা পরিকল্পিত কার্য্য-সম্পাদনের নিয়ন্ত্রণকারী। এই গেজেট প্রকাশের পরিকল্পনা তাঁহারই মস্তিষ্ক-প্রসূত। আমরা জানি, তিনি ইহার পরিচালনার্থ একটি বিস্তৃত কর্ম্মপদ্ধতি প্রস্তুত করিতেছিলেন।"

সুভাষচন্দ্র বসুর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অবস্থিতিকালে তাঁহাকে কর্পোরেশনের কার্য্য-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখিতে এবং তৎসংশ্লিষ্ট লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইত। পরে যখন গভর্ণমেণ্ট উহা বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন কর্পোরেশন মিঃ জে. সি. মুখার্জ্জিকে তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য প্রথমে তিন মাসের জন্য নিযুক্ত করিলেন; তৎপরে সুভাষচন্দ্রকে আরও ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং এই অস্থায়ী ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

গ্রেপ্তারের পর সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে কিছু দিন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়, পরে তথা হইতে তিনি বহরমপুর

জেলে স্থানান্তরিত হন। বহরমপুর হইতে তাঁহাকে ব্রহ্ম-দেশের মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত করা হইল।

মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত জীবনে নির্জ্জন কারাবাসের ফলে এবং অতিরিক্ত গ্রীষ্মাধিক্যহেতু সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ইহাতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মান্দালয় হইতে কলিকাতায় না আসিয়া সোজাসুজি ইয়োরোপ যাওয়ার অনুমতি দিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্র গভর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট মান্দালয়ে অবস্থিত বন্দীদিগকে পূজা ও ধর্ম্মকার্য্যের জন্য অর্থ প্রদানে অস্বীকৃত হন। এই অস্বীকৃতির প্রতিবাদ-স্বরূপ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সুভাষচন্দ্রও অন্যান্য বন্দিগণের সহিত অনশন-ব্রত অবলম্বন করেন। কলিকাতা কর্পোরেশন ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সভায় গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র কলিকাতা মহানগরীর নাগরিকবৃন্দ গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রতিবাদে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালন করে; পুনরায় ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলার অম্লান-কুসুম-তুল্য সুকুমার সন্তানগণের দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া কলিকাতাবাসী দ্বিতীয় বার হরতালের অনুষ্ঠান করে। অবশেষে সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী বন্দিগণ ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে অনশন-ব্রত পরিহার করেন।

এই অনশন-ব্রত উদ্‌যাপনে সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী বন্দি-গণের মানসিক শক্তি কিরূপ বিপুল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। সাধারণ মানুষ কয়েক ঘণ্টা বা দুই-এক দিনের উপবাসে কিরূপ কাতর হইয়া পড়ে, তাহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়; কিন্তু যাহারা প্রায় পনের দিন ক্ষুৎ-পিপাসার কঠোর জ্বালা নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য করিতে পারে,—তাহারা বাস্তবিকই প্রণম্য ও নমস্য। সাধারণের গণ্ডী অপেক্ষা এই সমস্ত মহা-মানব যে অনেক ঊর্দ্ধস্তরে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন মঙ্গলবার, চির-তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের দুর্জ্জয়-লিঙ্গ শৈল-শিখরে বাংলার গৌরবরবি মহামতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন চিরকালের জন্য অস্তাচলে গমন করেন। সুভাষচন্দ্র তখন সুদূর ব্রহ্মদেশে মান্দালয়ে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। সুতরাং দেশবন্ধুকে হারাইয়া তাঁহার অন্তরে শোক-দুঃখের যে বিরাট্ ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতেছিল, তখন তাহার কোন বাহ্য বিকাশ পরিলক্ষিত হয় নাই।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ মান্দালয় হইতে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের ব্যথা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই পত্রে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্ঘ-গঠন শক্তি, অনুগত ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা, কবিত্ব, ধর্ম্ম এবং পরোপকার-বৃত্তির বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র এই একখানি পত্রে দেশবন্ধুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার

যেরূপ বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ সুসংযত ভাষায় অনুরূপ ভাবের আলোচনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে সেই পত্র হইতে স্থানে-স্থানে সামান্য উদ্ধৃত হইল—

"তাঁহার (দেশবন্ধুর) জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম; কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি? * * * দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আরোগ্যলাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি দুই বার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্ব্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিলাম—'আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন—'না, আমি তোমাদের শীগ্‌গির খালাস করে আন্‌ছি।'

হায়! তখন কে জানিত যে ইহজীবনে আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব না! *** তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। *** জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি—এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। আমি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি, তিনি সর্ব্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। *** কত বিভিন্ন রকমের লোক হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত

তাঁহার প্রভাব ছিল। সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জন-সমাজে তিনি চারিদিক্ হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন *** সহকর্ম্মী বা অনুচরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবনের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর-জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ী সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্র—এমন কি, তাঁহার শয়ন-প্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল।* * * দেশবন্ধুর সঙ্ঘের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম ও শৃঙ্খলা। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু একবার কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেলে সকলকে সেই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্ত্তী হওয়ার নিয়ম ভারতবর্ষে নূতন নয়। ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথমে ভারত-বাসীকে এই শিক্ষা দিয়া যান। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৌদ্ধগণ প্রার্থনার সময় বলিয়া থাকেন—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

বস্তুতঃ কি ধর্ম্মপ্রচার, কি স্বদেশ-সেবা, সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবর্ত্তিতা ভিন্ন কোন মহৎ কাজ জগতে সম্ভবপর নয়।*** বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নীরস বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল।*** বাংলার শিক্ষা ও সভ্যতার সার সঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয়, দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।*** জীবনে-মরণে শয়নে-স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান—এক চিন্তা—স্বদেশ-সেবা—এবং সেই স্বদেশ-সেবাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সোপান-স্বরূপ।"

—দেশবন্ধু-স্মৃতি, পৃঃ ৫৪৩-৬৫

অবশেষে সুভাষচন্দ্রের দেহে ক্ষয়-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষার্থ তাঁহাকে রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় আনিয়া ব্যারাকপুরের নিকট গঙ্গাবক্ষে

বজ্রায় রাখা হয় এবং ডাক্তারী পরীক্ষা নিষ্পন্ন হয়। আড়াই বৎসরেরও অধিক কাল কারাবাসের পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয়।

তাঁহার মুক্তিলাভের একদিন পরে কলিকাতা কর্পোরেশন সাদরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কর্পোরেশন মহামতি সুভাষচন্দ্রকে ছুটি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা শেষ হইবার দুই দিন পরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ঠিক দুই দিন পূর্ব্বে অস্থায়ী কর্ম্মসচিব মিঃ জে. সি. মুখার্জ্জি সুভাষচন্দ্রের স্থলে স্থায়ী প্রধান কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জন-নায়ক

সাইমন-কমিশন বয়কট—মহাত্মার সহিত মতভেদ—কংগ্রেসের কলিকাতা-অধিবেশন—লাহোর-অধিবেশন—নানা সংশ্রবে সুভাষচন্দ্র—রাজনীতিক লাঞ্ছিতগণের দিবসে শোভাযাত্রা—নয়মাস কারাদণ্ড—ষ্টুডেণ্টস কনফারেন্স—স্বদেশী লীগ।

রোগশয্যা পরিত্যাগের পরই সুভাষচন্দ্র পুনরায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনপদে সাহায্য-প্রদানের চেষ্টায় অগ্রণী হইলেন। পুনরায় নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইয়া দেশবন্ধুর আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্যও সুভাষচন্দ্র বদ্ধপরিকর হইলেন এবং দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই সময় সাইমন-কমিশন ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহারা ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিবেন এবং স্থির করিবেন যে ভারতবর্ষকে কতটা শাসন-ভার দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবেন।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তখন সুভাষচন্দ্র ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। কমিশনের ঐ উদ্দেশ্য—অর্থাৎ ভারতবর্ষকে কতটুকু দেওয়া যাইতে পারে এই সঙ্কীর্ণ নীতি তাঁহাদের মনঃপূত হইল না; তাহার ফলে কংগ্রেস স্থির করিলেন, সাইমন-কমিশন বয়কট করা হইবে।

১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন-কমিশন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিতেই, সহস্র কণ্ঠে "সাইমন, ফিরিয়া যাও," জনমতের এই সুস্পষ্ট দাবী সমস্বরে ঘোষিত হইল এবং শত-শত কৃষ্ণ পতাকা সঞ্চালিত হইয়া কমিশনকে অবাঞ্ছিত বলিয়া প্রচার করিল। বাংলাদেশে সাইমন-কমিশন বয়কটকে তীব্র করিয়া তুলিলেন সুভাষচন্দ্র স্বয়ং!

সুভাষচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, এই সাইমন-কমিশনকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি এমন এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ জনমতের নিকট ব্রিটিশ-প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য অবনত হইয়া যায়! সেইজন্য মে মাসে তিনি সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু

মহাত্মা গান্ধী কোনদিনই এমন চরমপন্থী ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন, আবেদন-নিবেদন ও আপোষ করিয়া যতটা আদায় করিয়া লওয়া যায় তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের উগ্রপন্থা তিনি অনুমোদন করিতে পারিলেন না। তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া সুভাষচন্দ্রকে জানাইয়া দিলেন, "আমি এ কাজে ভগবানের কোন নির্দ্দেশ পাইতেছি না।"

অবশ্য ইহাতে মহাত্মা গান্ধীকে কোন দোষ দেওয়া চলে না ; কারণ, ইহার পূর্ব্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে "নেহেরু-কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা 'পূর্ণ স্বাধীনতা' হইলে, সে পথ নিতান্তই বিপজ্জনক ; সম্ভবতঃ ইহা ধারণা করিয়াই সেই কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতা না মানিয়া, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনকেই তাঁহাদের ঈপ্সিত বস্তু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও এই মতের অনুকূলেই ছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে সর্ব্বদলের এক সম্মেলন হয়। তাহাতেও নেহেরু-কমিটির স্বায়ত্বশাসন-প্রস্তাবকেই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইল। ইহাতে সুভাষচন্দ্র ও পণ্ডিত জওহরলাল ক্ষুব্ধ হইয়া 'স্বাধীনতা-সঙ্ঘ' নামে একটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন।

সাইমন-কমিশনকে কেন্দ্র করিয়া জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব-ভার মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ না করায় সুভাষচন্দ্র ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মহাত্মার এই নিষ্ক্রিয়তা একেবারেই

সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই বৎসরই মে মাসে পুণায় যে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স হয়, তিনি তাহাতে সভাপতিত্ব করিবার কালে মহাত্মার এই নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করেন। মহাত্মার চিন্তাধারা ও কার্য্যপদ্ধতির সহিত তিনি যে একমত হইতে পারিতেছেন না, প্রকাশ্য জনসভায় সম্ভবতঃ এই তাহার প্রথম অভিব্যক্তি!

সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির ত্রিচত্বারিংশৎ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্র পুনরায় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং স্বয়ং স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর জেনারেল-অফিসার-কম্যাণ্ডিং-রূপে জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতি পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে বিরাট শোভাযাত্রায় সম্বর্দ্ধনা করেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মহাত্মার মতবাদের সহিত সুভাষচন্দ্রের পুনরায় প্রকাশ্য বিরোধিতা হইল। কারণ, মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব ছিল আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব; কিন্তু দেশপ্রেমের মূর্ত্ত আগ্নেয়গিরি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ব্রিটিশ রাজের অধীনে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার লইয়া তৃপ্ত ভাবে অবস্থান করা, একেবারেই ছিল অসম্ভব। স্বাধীনতা—পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য; কংগ্রেসকে তিনি সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত দেখিতে আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে হতাশ হইয়া তিনি মহাত্মা গান্ধীর আপোষ-মীমাংসা প্রস্তাবের জ্বলন্ত ভাষায় প্রতিবাদ করেন।

তিনি বলিলেন,—

"সুদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার প্রার্থী আমরা নহি। ইহা আমাদের অবিলম্বে প্রাপ্য বস্তু।" *

তিনি আরও বলেন,—

"আপনারা সকলেই জানেন, দেশে জাতীয় আন্দোলনের উষাকাল হইতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা বলিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই বুঝিয়াছে—ডোমিনিয়ান্ ষ্টেটাস্‌কে কখনও স্বাধীনতা বলিয়া ব্যাখ্যা করে নাই।" †

তাঁহার অভিমত এই যে, ব্রিটিশের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব্বে কখনও প্রকৃত স্বাধীনতালাভ হইতে পারে না।‡

সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, পূর্ণ-স্বাধীনতাই কংগ্রেসের কাম্য, ইহা ঘোষণা করিয়া তখন হইতেই সরকারের বিরুদ্ধে আপোষ-বিহীন সংগ্রাম সুরু করা। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বলিলেন, "ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি ১৯২৯ সালের মধ্যে নেহেরু-কমিটির রিপোর্ট মানিয়া লইয়া স্বায়ত্বশাসন মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাহা গ্রহণ করিবে। যদি তাহা না করে,

* "We stand for independence not in the distant future but as our immediate objective."

—*The Calcutta Municipal Gazette*, Vol. XLII, No. 16, P. 442(c).

† "So far as Bengal is concerned, you are aware that since the dawn of the National movement in this country, we have always interpreted freedom as complete and full independence. We have never interpreted it in terms of Dominion Status."

—*Ibid*, P. 443(c).

‡ "He was of opinion that there could be no true freedom till British connection was severed."

—*Ibid*, P. 442(c).

কংগ্রেস তাহা হইলে অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করিবে।”

সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মহাত্মার তথা-কথিত স্বাধীনতা, এই দুই বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হইল। কিন্তু জনমত তখনও এত তীব্র হইয়া উঠে নাই যে প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা ও সঙ্কোচের গণ্ডী এড়াইয়া তরুণের বিপদ্‌সঙ্কুল পথ বাছিয়া লইবে! কাজেই সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইল না—তিনি পরাজিত হইলেন।

সুভাষচন্দ্র পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকে সম্ভবতঃ চিন্তিত হইতে হইল! তিনি লক্ষ্য করিলেন, সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল প্রভৃতি চরমপন্থী তরুণের দল ক্রমশঃই নরমপন্থী জননেতা কংগ্রেসের সতর্ক চিন্তাধারাকে যেন অতিক্রম করিয়া যাইতেছে! সুতরাং লাহোরে কংগ্রেসের যে পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে, তাহার সভাপতি নির্ব্বাচনে খুব সাবধানতার প্রয়োজন অনুভব করিলেন।

চিন্তা অনুযায়ী কার্য্য হইল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লাহোর-কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহাকে এই মর্য্যাদা-দানের ফলে পণ্ডিতজী চরমপন্থী দল হইতে মহাত্মা গান্ধীর নরমদলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং মহাত্মা গান্ধীর অভিমতকেই নিজের মত বলিয়া মানিয়া লইলেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সম্ভবতঃ ইতোমধ্যে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কংগ্রেসের কলিকাতা-অধিবেশনে তিনি সুভাষচন্দ্রের যে পূর্ণ স্বাধীনতা-প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন,

লাহোর-অধিবেশনে তিনি নিজেই সেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন।

সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা সর্ব্বদাই কিছু অগ্রবর্ত্তী; তিনি প্রস্তাব করিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে পূর্ণভাবে বয়কট করা হউক, আইন-অমান্য আন্দোলন করা হউক এবং পাশাপাশি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হউক। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

লাহোর-অধিবেশনের পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন এবং লণ্ডনে 'রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স' নামে এক সর্ব্বদল-সম্মেলন হইবে ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অনেকেই ছিলেন এই কন্‌ফারেন্সে যোগদানের পক্ষে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও কিচ্‌লু প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র ইহার বিরোধিতা করিলেন। তিনি রাজপুরুষদের কাহারও কাছে কোন ভিক্ষার প্রার্থনা বা কাহারও সহিত কোন আপোষমূলক আলোচনা চালাইবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। অনমনীয় সুভাষচন্দ্রের ইহাই ছিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

অক্লান্তকর্ম্মী সুভাষচন্দ্র দেশের প্রায় প্রত্যেক কাজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় হিন্দুস্থান সেবাদল-কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং

সমগ্র দেশকে সামরিক শৃঙ্খলায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—

"বর্ত্তমান কালে দেশে যুবক-আন্দোলন ও শরীর-চর্চ্চার আন্দোলনের দ্রুত প্রসার একটি বিশেষ আশার বিষয়। এই দুইটি আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ-সাধন একান্ত দরকার।

যুবকগণকে ব্যায়ামের দ্বারা সুগঠিত, শিক্ষিত ও সংযত স্বেচ্ছাসেবকে রূপান্তরিত করিতে হইবে; তবেই আমরা নূতন এমন একটি পুরুষের আবির্ভাবের আশা করিতে পারিব, যাহারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া উহা রক্ষা করিতে পারিবে।" *

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির সাধারণ সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল-ভারত ট্রেড-ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই পদে তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় কাউন্সিল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে পরিচালিত করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাউন্সিল ভঙ্গ হয় এবং অধিকাংশ

* "One of the hopeful features of the times is the rapid expansion of the youth movement and the physical culture movement all over the country. There must be a co-ordination between these two movements. Youths must be drilled, trained and disciplined as Volunteers. Then alone can we hope to rear up a new generation of men who will win freedom for India and have strength to retain it."

—*Ibid*, P. 442(d).

কংগ্রেস-কর্ম্মী অতিজন-ভোটে কিংবা বিনা বাধায় কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ কলিকাতায় একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। এই শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল—নিখিল-ভারতীয় রাজনীতিক লাঞ্ছিতগণের দিবস উপলক্ষে রাজনীতিক কারণে লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি-জ্ঞাপন। এই শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি অভিযুক্ত হন এবং বিচারে ২৩শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহার প্রতি নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যতীন্দ্রনাথ দাস লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে অনশনব্রত গ্রহণ করেন এবং ৬৩ দিন উপবাসের পর ইচ্ছামৃত্যু যতীন দাসের অমর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্ণরথে অমর-লোকে প্রস্থান করে। যতীন দাসের শবদেহ কলিকাতায় আনা হইল, সুভাষচন্দ্র শবানুগমনের বিরাট্ শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

উক্ত সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি হাওড়া পলিটিক্যাল কনফারেন্সে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাঞ্জাব ষ্টুডেণ্টস্ কনফারেন্সের লাহোর-অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে তিনি দেশের যুবকগণের

সম্মুখে স্বাধীনতার আদর্শ মূর্ত্তি উপস্থাপিত করিয়া, সেই আদর্শ অনুসরণের ভার যুবকগণের হস্তে সমর্পণ করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মধ্যপ্রদেশ 'ও বেরারের স্টুডেণ্টস্ কন্‌ফারেন্সের অমরাবতী-অধিবেশনে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের সহিত কিছুকাল হইতেই তাঁহার অনৈক্য হইতেছিল। সুতরাং অবশেষে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-পদ পরিহার করেন। তিনি পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের সংশোধনের চেষ্টা করিয়া কলিকাতা-অধিবেশনের মতই অকৃতকার্য্য হইলেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র "দি বেঙ্গল স্বদেশী লীগ" গঠন করেন। তিনি নিজে এই লীগের সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট; শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, জেনারেল সেক্রেটারী এবং শ্রীযুক্ত আনন্দজি হরিদাস কোষাধ্যক্ষ হইলেন। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে এই লীগের কার্য্যালয় অবস্থিত ছিল।

বেঙ্গল স্বদেশী লীগের গবেষণা-শাখায় ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল ও ডক্টর সুহৃদ্‌কুমার মিত্র সদস্য এবং ডক্টর হরিশচন্দ্র সিংহ সম্পাদক ছিলেন॥

লীগের উদ্দেশ্য ছিল—ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, অর্থনীতিক

ও জাতীয় কর্ম্মিদলের কার্য্যাবলীর সম্মেলনে বাংলাদেশে স্বদেশীর প্রসার-বৃদ্ধি।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল স্বদেশী লীগের গবেষণা-শাখা হইতে সুভাষচন্দ্রের সম্পাদনায় "স্বদেশী এণ্ড বয়কট" নামক ইংরেজী বুলেটিন প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ব্রহ্মদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশে এবং সমগ্র ভারতে বিদেশী দ্রব্যের— বিশেষতঃ ব্রিটিশজাত দ্রব্যের আমদানি লইয়া ইহাতে আলোচনা চালান হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ব্রিটিশজাত দ্রব্যের আমদানী দিন-দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে— সুতরাং বয়কট বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান ও মেয়র সুভাষচন্দ্র

মেয়র নির্ব্বাচিত—গোলটেবিল বৈঠক-প্রসঙ্গে—গতিবিধি-নিয়ন্ত্রণ—নিষেধাজ্ঞা অমান্য—কারাবাস—পুলিশের যষ্টি-প্রহার—করাচি কংগ্রেসে—হিজলী বন্দিশালায় গুলি—প্রতিবাদে পদত্যাগ।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় অন্তরীণ অবস্থায় থাকা হেতু তিন মাসের মধ্যে অল্‌ডারম্যানের বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখনও কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী অবস্থায় ছিলেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে সুভাষচন্দ্রকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিদান করা হয়। তৎপর-দিবস তিনি অল্ডারম্যানের বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করেন, এবং তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মেয়র-পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার মেয়র-পদলাভে কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্ব্বত্র একটা আনন্দের ও উৎসাহের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল।

মেয়র-পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর অভিনন্দন-সূচক বক্তৃতা-বলীর অবসানে, মেয়র সুভাষচন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলেন—

"প্রথম মেয়রের প্রথম বক্তৃতাই মিউনিসিপ্যাল টেষ্টামেণ্ট বা ধর্ম্ম-পুস্তক-স্বরূপ হইবে; দেশবন্ধুর কর্ম্ম-পদ্ধতি ছিল—দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যপ্রদ বাসগৃহ প্রদান। এই সমস্তই দরিদ্রের পক্ষে আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন স্বল্প ব্যয়ে বিশুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য ও দুগ্ধ-সরবরাহ, শোধিত ও অশোধিত জল-সরবরাহের প্রাচুর্য্য, জনাকীর্ণ ও বস্তি-অঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা অবলম্বন, যান-বাহনের উন্নতি-বিধান—এই সমস্তও তাঁহার কার্য্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্পোরেশনেই ইয়োরোপীয় ফ্যাসিজম্ ও সোশ্যালিজ্‌মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। একদিকে ন্যায়, সাম্য ও মৈত্রী, ইহারা সোশ্যালিজ্‌মের প্রতীক; অন্যদিকে সংযম ও কর্ম্মদক্ষতা—এই দুইটি ফ্যাসিজ্‌মের প্রতীক; প্রকৃত পক্ষে সোশ্যালিজ্‌মের এবং ফ্যাসিজ্‌মের অপূর্ব্ব সমন্বয়—এই কর্পোরেশন।"

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় তদানীন্তন গোলটেবিল-বৈঠকের তীব্র নিন্দা করা হয়; কারণ, গোলটেবিল-বৈঠক

প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধি-সম্মেলন নহে। ১৩ই নভেম্বর লণ্ডনে গোলটেবিল-বৈঠকের আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার মেয়র-রূপে সুভাষচন্দ্র পাবনা পরিভ্রমণে গমন করেন ; তৎকালে পাবনা-মিউনিসিপ্যালিটি একটি সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করে। এই অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—

"মানব-জীবন একটি অখণ্ড পূর্ণতা মাত্র। ইহাকে বায়ুহীন কক্ষে বিভক্ত করা চলে না। অংশে অংশে ইহার প্রতি দৃষ্টি-প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। নাগরিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক জীবনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন জীবন মনে করা যাইতে পারে না। অভ্যন্তর হইতে একটা বিরাট আদর্শ উদ্ভূত না হইলে নাগরিক জীবন সুন্দর ও পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে, স্বাধীনতা ব্যতীত সেই আদর্শ উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। * * * প্রভাত-সূর্য্যোদয়ে যেমন সুদীর্ঘ রজনীর তমসাবৃত মেঘমালা দূরে পলায়ন করে, তেমনি আমরা শীঘ্রই দেখিব যে যুগ-যুগান্তরব্যাপী পরাধীনতা প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মত অন্তর্হিত হইবে এবং স্বাধীনতা-সূর্য্য জাতির ললাটে গৌরবময় বিজয়-টীকা পরাইয়া দিবে।"

সুভাষচন্দ্রের এই সকল বক্তৃতা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, স্বাধীনতা ছিল তাঁহার হৃদয়-শোণিত ; স্বাধীনতাকে বাদ দিয়া তিনি কখনও কিছু ভাবিতেই পারিতেন না।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। মালদহ পরিভ্রমণকালে তাঁহার উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে উক্ত

জেলায় প্রবেশের এক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। নির্ভীক সুভাষচন্দ্র এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন। ফলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রেলওয়ে-ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে তাঁহার বিচার হয়।

বিচারকালে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "এই আদেশে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার সম্পূর্ণ অপব্যবহার করা হইয়াছে। আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন ভারতবাসী হিসাবে আমি ইহা মানিয়া লইতে পারি না।"

এই বিচারে তাঁহার প্রতি বিনাশ্রমে এক সপ্তাহের জন্য কারাবাসের আদেশ হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা-দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং পুরোভাগে থাকিয়া একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। পুলিশ এই শোভাযাত্রা লাঠি-চালনা দ্বারা ভাঙ্গিয়া দেয় এবং সুভাষচন্দ্রও প্রহৃত হন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা পরিচালনা করায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাঁহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু পরিপূর্ণ ছয় মাস তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। কারণ, বড়লাট লর্ড আরউইনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর ইতোমধ্যে এক চুক্তি (Pact) সম্পাদিত হইয়াছিল।

লর্ড আরউইন যখন দেখিলেন যে, অসহযোগ-আন্দোলনের ফলে বিলাতের গোলটেবিল-বৈঠকে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করিলেন না, তিনি তখন কৌশলে অসহযোগ-

আন্দোলন দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাত্মার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তিনি এইটুকু ব্যবস্থা করিলেন যে, মহাত্মা তাঁহার অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ করিবেন এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল-বৈঠকে যোগদান করিবেন। গভর্ণমেণ্টও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত লর্ড আরউইনের এই চুক্তির ফলে সুভাষচন্দ্র পূর্ণদণ্ড ভোগের পূর্ব্বেই, ৮ই মার্চ্চ তারিখে মুক্তিলাভ করিলেন।

গান্ধী ও লর্ড আরউইনের চুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সময় একদল উগ্রপন্থী কংগ্রেস-কর্ম্মী তখন মহাত্মাকে অনুরোধ করে যে, পাঞ্জাব-ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগৎ সিংএর মুক্তির জন্যও তিনি যেন চেষ্টা করেন।

ভগৎ সিং পাঞ্জাব পরিষদ-কক্ষে বোমা-নিক্ষেপ করিয়া ধৃত হইয়াছিলেন। বড়লাট তাঁহার মুক্তির কোন বন্দোবস্ত করিলেন না ; তাঁহার মুক্তির প্রশ্ন পাঞ্জাব-গভর্ণমেণ্টের ব্যাপার বলিয়া, তিনি এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। ইহা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী যে লর্ড আরউইনের সহিত চুক্তি-বদ্ধ হইলেন এবং অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ করিয়া গোলটেবিল-বৈঠকে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন, ইহাতে দেশের যুব-সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশন-কালে, প্রায় পাশাপাশি 'নও-জোয়ান-কংগ্রেস' নামে অপর একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন।

তরুণ সম্প্রদায়ের এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র সভাপতি

নির্ব্বাচিত হইলেন; কিন্তু সম্মেলনের অধিবেশন হইবার পূর্ব্বেই ভগৎ সিং ও শুকদেব সিংএর ফাঁসি হইয়া গেল। ইহাতে তরুণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যেন চরমে উঠিল! তাঁহারা মনে করিলেন, যাঁহার গভর্ণমেণ্ট এত বড় একটা সাঙ্ঘাতিক কাজের পৃষ্ঠপোষক ও অনুমোদক, তাঁহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ করা মহাত্মার খুবই অন্যায় হইয়াছে। সুতরাং অতঃপর তিনি যখন করাচিতে উপস্থিত হইলেন, তখন ক্ষুব্ধ জনতা তাঁহাকে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন করিয়া অভ্যর্থনা করিল।

নওজোয়ান কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে, সেই মণ্ডপেই নিখিল-ভারত লাঞ্ছিত রাজনীতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সুভাষচন্দ্র তাহাতেও সভাপতিত্ব করেন। তখন সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "আইন-অমান্য-আন্দোলন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া মহাত্মাজী দেশের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে গুরুতর ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বড়লাটের চুক্তি দেশের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র!"

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে করাচি-মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতা-কর্পোরেশনের লর্ড-মেয়র সুভাষচন্দ্রকে এক স্বাগত-অভিনন্দন প্রদান করিয়া সম্বর্দ্ধিত করেন: এই অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র প্রথমেই দেখাইয়া দেন যে, এই পরাধীন দেশে লর্ড বা প্রভু কেহ নাই—সকলেই দাস।*

* "Subhash chandra Bose...pointed out that in their enslaved country, there were yet no lords but all slaves."—*Ibid*. P. 444.

প্রসঙ্গতঃ তিনি পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের ভ্রান্ত ধারণার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের মতে পুরাকালে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বা স্বায়ত্তশাসনমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের এই ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা প্রাচ্য পণ্ডিতগণের গবেষণায় সপ্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষ গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত-শাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল।

তাঁহাদের আর একটি অভিমত যে, নাগরিক জীবনের সহিত রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না ;—কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সময় সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দেশবন্ধুর মতে নাগরিক শাসন ও রাষ্ট্রশাসনকে জলরোধী কক্ষের মত পৃথক করা সম্ভব নহে ; উভয়কে একটি অখণ্ড বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটি সাহায্য করিলে জাতীয়তার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইতে পারে ; সুতরাং জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে রক্ষা করা এবং সহস্র-সহস্র নূতন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য।

সুভাষচন্দ্রের এই বক্তৃতায়ও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পরাধীনতাকে তিনি কত বড় একটা দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন এবং জাতীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ কতদিকে উন্মুখ হইয়া থাকিত !

স্বাধীনতা যাঁহার অস্থি-মজ্জায় এমন ভাবে মিশিয়া ছিল, সরকারী দম্ভ ও অত্যাচারকে তিনি যে ঘৃণিত ও পাশব কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং সারা ভারতবর্ষে তখন সরকারী চণ্ডনীতি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, বিশেষতঃ বন্দিশালায় আবদ্ধ নিরস্ত্র রাজনৈতিক বন্দীদের উপর তখন স্থানে-স্থানে যে সব অত্যাচার হইতেছিল, সুভাষচন্দ্র তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন।

নিরস্ত্র বন্দীদের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার হইল হিজলী বন্দিশালায়। সেখানে বন্দীদের উপর বেপরোয়া লাঠি-চালনা হইল—গুলি-চালনা হইল। গুলি-চালনার ফলে দুইজন রাজবন্দী নিহত হইলেন।

সকলেই আশা করিয়াছিল, কংগ্রেস এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করিবেন; কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে বিশেষ কোন আন্দোলন করিলেন না।

নিরস্ত্র বন্দীদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করা যে কত নৃশংস ও মর্ম্মান্তিক, সুভাষচন্দ্র তাহা উপলব্ধি করিলেন। তথাপি কংগ্রেস বিশেষ কোন আন্দোলনের পক্ষপাতী নহে, তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়া, প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সভাপতির পদ ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যানের পদে ইস্তফা দিলেন।

ইয়োরোপ-প্রবাস

১৪৪ ধারা অমান্য—গ্রেপ্তার—কারাবাস ও ইয়োরোপ যাত্রা—প্রত্যাবর্ত্তন ও পিতার মৃত্যু—আবার ইয়োরোপে—দেশবাসীর আমন্ত্রণে আগমন—গ্রেপ্তার—ইয়োরোপে তৃতীয়বার।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথমে ব্যারাকপুরে এক শ্রমিক-কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত না হইবার জন্য সুভাষচন্দ্রের উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করা হয়; কিন্তু চির-নির্ভীক সুভাষচন্দ্র গভর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিলেন।

ঢাকায় পুলিশের অবৈধ কার্য্য-কলাপের তদন্তের জন্য বেসরকারী তদন্ত-কমিটির সদস্যরূপে সুভাষচন্দ্র যখন ঢাকা যাইতেছিলেন, তৎকালে তেজগাঁও ষ্টেশনে তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে পুনরায় এক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়; কিন্তু সুভাষচন্দ্র এই বারও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ঢাকা গমন করেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, উক্ত দুইবারের একবারও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অজুহাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য বোম্বাই গমন করেন। মহাত্মা তখন সবে মাত্র গোলটেবিল-বৈঠক হইতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে

আলোচনার বিষয় ছিল—বাংলার রাজনীতিক অবস্থা ও পুলিশের ক্রমবর্দ্ধিত হস্তক্ষেপ। মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশনেও যোগদান করিলেন। মহাত্মার সহিত আলাপ-আলোচনা শেষ করিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিবার পথে কল্যাণ ষ্টেশনে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশন অনুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এইবার তাঁহাকে বাংলার বাহিরে বিভিন্ন জেলে রাখা হয়, ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহাতে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ভগ্নস্বাস্থ্য-হেতু ভারতের বাহিরে চিকিৎসার্থ গমন করিবার জন্য তাঁহাকে মুক্তিদান করেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী* তারিখে জননী-জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ যাত্রা করেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে তিনি ভিয়েনায় উপনীত হইলেন। তথায় তিনি একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে বাস করিতে থাকেন। ভিয়েনায় তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, অধুনা-পরলোকগত ভি. জে. পেটেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ভি. জে. পেটেলের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী আইন-অমান্য-আন্দোলন বন্ধ করায় ভি. জে. পেটেল ও

* ২৩শে ফেব্রুয়ারী—আনন্দবাজার পত্রিকা।

সুভাষচন্দ্র—উভয়ে সমবেত ভাবে মহাত্মার এই কার্য্যের সমালোচনা করিয়া এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

সুভাষচন্দ্রকে মিঃ পেটেল এতটা বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার নিমিত্ত তিনি তাঁহার উইলে একটা বিপুল অর্থ সুভাষচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করিবার নির্দ্দেশ দিয়া যান; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের দুর্ভাগ্য, তিনি যেন চিরদিনই একটা সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল ছিলেন এবং এই পরাধীন দেশের স্বাভাবিক ক্লেদ-কালিমার ঊর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহার জাতীয় উন্নতির কোন স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে পারিবেন না! সুতরাং স্বার্থ-বিশিষ্ট ব্যক্তির নিয়োজিত কৌঁসলীর আইনগত কূটতর্কে স্বর্গত পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ ভি. জে. পেটেলের সেই নির্দ্দেশ বাতিল হইয়া গেল—সুভাষচন্দ্রের হাতে কোন অর্থই আসিল না।

ইয়োরোপ প্রবাস-কালে রুশিয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনের তাঁবে অনুষ্ঠিত লণ্ডন পলিটি-ক্যাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি-পদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল; কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার লিখিত অভিভাষণ উক্ত সভায় পাঠ করা হইয়াছিল। তাঁহার এই অভিভাষণ সামুদ্রিক শুল্ক-আইন অনুসারে ভারতে আসা নিষিদ্ধ।

তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক 'ভারতীয় সংগ্রাম' (In Struggle) লণ্ডনের একটি পুস্তক-প্রকাশক কোম্পানী প্র

করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের লোকমান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ শতমুখে এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থেরও ভারতে আগমন নিষিদ্ধ।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে জানকীনাথ বসু মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। সুভাষচন্দ্র চিরস্নেহময় পিতার অসুস্থতার সংবাদে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ৩রা ডিসেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতেই আকাশ-যানে ইয়োরোপ হইতে করাচি উপনীত হইলেন। কিন্তু দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়—করাচি পৌঁছিয়াই তিনি পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন। তাঁহার দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হওয়া যে কি শোকাবহ ঘটনা, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

শোক-ব্যথিত হৃদয় লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দম্‌দম্‌-এরোড্রোমে তাঁহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইল যে, তাঁহাকে সরাসরি এলগিন রোডের বাড়ীতে যাইতে হইবে এবং নিজ গৃহে বন্দী ভাবে বাস করিতে হইবে ; পরে, সাত দিনের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে—এই মর্ম্মে অপর একটি নিষেধাজ্ঞা তাঁহার উপর জারি করা হইল। অবশেষে পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবস্থান করিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

গান্ধী পিতৃ-শ্রাদ্ধের অবসানে সুভাষচন্দ্রকে আবার বিধবা জননী দুঃখিনী জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ১৯৩৫

কতকগুলি মশক বাঁধা, তাহার উপরে জাল বিছানো। পৃঃ—৮০

খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী ক্ষুণ্ণমনে, ব্যথিত ও ভগ্ন হৃদয়ে অশ্রু-সজল চক্ষে সুদূর সাগর-পারে যাত্রা করিতে হইল।

ইয়োরোপে ফিরিয়া গিয়া তিনি এমন একটি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ড্যামিয়েল অস্ত্রোপচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

অস্ত্রোপচার-কার্য্য সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল; তিনি ধীরে-ধীরে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হন।

এই সময় তিনি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস (History of the Indian National Movement) রচনায় আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কঠোর পরিশ্রমে অক্ষম হওয়ায় তিনি এই গ্রন্থ শেষ করিতে পারেন নাই।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় মধ্য-ইয়োরোপীয় সমিতির (Indian Central European Society) কন্‌ফারেন্সে সুভাষচন্দ্র যোগদান করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রোম নগরে অনুষ্ঠিত এসিয়াটিক ষ্টুডেণ্টস্ কন্‌ফারেন্সেও সুভাষচন্দ্র যোগদান করিয়া-ছিলেন। স্বনামধন্য সিনর মুসোলিনি এই কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ভিয়েনায় ফিরিয়া আসিলেন।

সেই বৎসরই মার্চ্চ মাসে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির লক্ষ্ণৌ-অধিবেশনে যোগদান করিয়া আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করিবেন; কারণ, লক্ষ্ণৌ-অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি এই অধিবেশনে যোগদান করেন, ইহাই দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা হইলে কি হইবে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন না; স্বদেশে ফিরিলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে, ইহা তাঁহারা প্রকাশ করিলেন। ভিয়েনার ব্রিটিশ কন্‌সালের নিকট হইতেও তিনি অনুরূপ একখানি পত্র পাইলেন। এই পত্রে তাঁহাকে জানান হইল—তিনি মার্চ্চ মাসেই ভারতে প্রত্যাগমন করিবেন, সংবাদ-পত্রে এইরূপ মন্তব্য পাঠ করিয়া ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে জানাইতেছেন যে, যদি তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে হয়ত তিনি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

এই পত্র পাঠ করিয়াও সুভাষচন্দ্রের সঙ্কল্প অচল-অটল রহিল। তিনি বুঝিলেন, দেশবাসীর আহ্বানে সাড়া দিতে গেলে গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহাকে বন্দী জীবন যাপন করিতে হইবে।

এখন এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য?—কিন্তু কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহার বেশী দেরী হইল না। যত বিপদ্‌ই

হউক, সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর আহ্বানে সাড়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন।

তাহা ছাড়া, সম্ভবতঃ আরও একটি কারণ ছিল। দেশকে যাহারা ভালবাসে, তাহারা দেশকে ছাড়িয়া দীর্ঘকাল বিদেশে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতে পারে না। ফরাসী সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রকৃতই ফ্রান্সকে ভালবাসিতেন; সেই জন্য তিনিও এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত জীবন দীর্ঘকাল যাপন করিতে পারেন নাই—গোপনে এল্‌বা ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রও নেপোলিয়নের মত ইয়োরোপ ত্যাগ করিয়া ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গভর্ণমেণ্ট-বিজ্ঞাপিত বন্দী-জীবনের বিভীষিকাও তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, বিপদের ঝঞ্ঝাবৃষ্টি মাথায় করিয়া তিনি আবার সাগর-পাড়ি দিলেন। চিরদিন বিদেশে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করা অপেক্ষা স্বদেশে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থিতিও তিনি শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তিনি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাকে ১৯১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া পুণা যারবেদা-জেলে রাখা হয়। বিভিন্ন জেলে অবস্থিতির পর তাঁহাকে তাঁহার দাদা শরৎচন্দ্র বসুর কার্শিয়াংস্থিত বাড়ীতে অন্তরীণ করা হয়।

সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে সমস্ত দেশে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ১০ই মে দেশের সর্ব্বত্র "নিখিল-ভারত সুভাষ-দিবস"

নির্দ্ধারিত হইল এবং ঐ দিন ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সভা-সমিতি ও বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল বন্দীজীবন যাপন করায় সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবশেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে মুক্তিদান করিলেন : তাঁহার মুক্তিতে দেশে আবার আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে শ্রদ্ধানন্দ-পার্কে এক জন-সভায় দেশবাসী তাঁহাকে তাহাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

মুক্তিলাভের পর তিনি পাঞ্জাবের ডালহৌসী সহরে হিমালয়-শিখরে স্বাস্থ্য-লাভার্থ গমন করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ২৮শে নভেম্বর তারিখে তিনি পুনরায় চিকিৎসার্থ আকাশ-পথে ইয়োরোপ যাত্রা করেন। তিনি ইয়োরোপে অষ্ট্রিয়ার বাদগাস-ষ্টাইন নামক স্থানে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসিত হইতে থাকেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন।

ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির সভাপতি

'হরিপুরা'-কংগ্রেস ১৯৩৮—'ত্রিপুরী'-কংগ্রেস ১৯৩৯—প্রতি-যোগিতা—জয়লাভ—মহাত্মার ক্ষোভ—হলওয়েল মনুমেণ্ট অপ-সারণ—সুদীর্ঘ হাজত-বাস—মুক্তি—নিরুদ্দেশ।

ইংলণ্ডে অবস্থিতি-কালে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির এক-পঞ্চাশত্তম 'হরিপুরা'-অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি ও পাণ্ডিত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। এই অভিভাষণে তিনি প্রথমেই সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"মানবের ইতিহাসের প্রতি প্রাথমিক দৃষ্টিপাতেই সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন আমাদিগকে আকর্ষণ করে। কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্ত্যে, সর্ব্বত্রই সাম্রাজ্য প্রথমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; পরে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখর অধিগত করিয়া ধীরে ধীরে হীনাবস্থায় নিপতিত হয় এবং কথনো কথনো মৃত্যুর আলিঙ্গনে লুপ্ত হইয়া যায়। পাশ্চাত্ত্যে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্য এবং বর্ত্তমান কালের তুর্কী-সাম্রাজ্য ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য এই নিয়মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; ভারতবর্ষেও মৌর্য্য, গুপ্ত এবং মোগল-সাম্রাজ্য ইহার ব্যতিক্রম নহে। ইতিহাসের এই সমস্ত বাস্তব ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কি সাহসের সহিত বলিতে পারেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যে অন্যরূপ বিধান রহিয়াছে? *

---

* "In the face of these objective facts of history, can any one be so bold as to maintain that there is in store a differe fate for the British Empire?"
—*The Calcutta Municipal Gazette*, Vol. XLII, No. 16, P. ৫২৫

* * * *

একথা সত্য যে প্রত্যেক সাম্রাজ্যই ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শাসন-কার্য্য চালাইয়া থাকে ; কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের মত এই নীতি এমন কৌশলপূর্ণ, ধারাবাহিক এবং নিষ্ঠুরভাবে অন্য কোন সাম্রাজ্য অনুসরণ করিয়াছে কি না সন্দেহ। *

* * * *

বর্ত্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমে আয়র্ল্যাণ্ড এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষ রহিয়াছে ; মধ্যভাগে প্যালেষ্টাইন, মিশর ও ইরাক-সহ বিরাজমান ; দূর প্রাচ্যে জাপান ও ভূমধ্যসাগরে ইতালী চাপ দিতেছে ; পটভূমিকায় সোভিয়েট রুশিয়া প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী জাতির হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক করিতেছে। এই সমস্ত বিষয়ের চাপ ও কঠোর শ্রম-স্বীকারের সম্মিলিত ফল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কতদিন সহ্য করিতে সমর্থ হইবে ? * * * পরিশেষে বলা চলে যে, আকাশ-সৈন্য আধুনিক যুদ্ধে যুগান্তর সংসাধিত করিয়াছে ; ইহাতে শক্তি-সাম্য পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি হইতে তিরোহিত হইয়াছে, এবং বিশাল সাম্রাজ্যের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত চরণ যুগল বর্ত্তমানে যেরূপ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। †

কিন্তু এই বিশ্বশক্তির মধ্য হইতে ভারতবর্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। আমাদের এই বিশাল দেশে ৩৫ কোটি লোকের বাস ; এক সময়ে এই দেশের বিশালতা এবং জনশক্তির বিপুলতা আমাদের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করিত ; কিন্তু বর্ত্তমানে উহা শক্তির

---

* "But I doubt if any Empire in the world has practised this policy so skilfully, systematically and ruthlessly as Great Britain." —*Ibid*. P. 445

† "The clay feet of a gigantic empire now stands exposed as never been before".—*Ibid*, P. 446.

আধার—যদি আমরা সম্মিলিত হইয়া আমাদের শাসনকর্ত্তার সম্মুখে সাহসের সহিত দাঁড়াইতে পারি।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র পুনরায় নিখিল-ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ত্রিপুরী-অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু নির্ব্বাচিত হইলেও, নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার বিজয়-গৌরব-লাভ জাতীয় ইতিহাসের এক ব্যথা-বিমণ্ডিত মসীলিপ্ত ইতিহাস।

এবার নির্ব্বাচন-প্রার্থী ছিলেন তিনজন—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ও সুভাষচন্দ্র। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ডাঃ সীতারামিয়ার অনুকূলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া আসিলেন; সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রহিলেন দুইজন—ডাঃ সীতারামিয়া ও সুভাষচন্দ্র।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ ডাঃ সীতারামিয়ার অনুকূলে ছিলেন, তাঁহারা সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেন। ইহার কারণ,—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল, তাঁহারা দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ-শাসিত অংশ লইয়া এক যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তোলেন। মহাত্মা-প্রমুখ নরমপন্থী রাজনীতিকগণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই আকাঙ্ক্ষার স্বপক্ষে ছিলেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ মহাত্মার দলীয় এই দুর্ব্বলতাকে আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের অভিমত ছিল, আপোষ-মনোবৃত্তিতে কোনদিনই স্বাধীনতা আসিবে না। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে

আপোষ-বিরোধী মনোভাব লইয়া, তাহা জোর করিয়া আদায় করিতে হইবে।

দৃষ্টিপথের এই পার্থক্য-হেতু মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন পছন্দ করিলেন না, তাঁহারা নানাভাবে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধাচণে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও গণভোটে সুভাষচন্দ্রই নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহার এই নির্ব্বাচনে ইহাই প্রতীয়মান হইল যে, তিনি মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষাও ব্যাপকভাবে দেশবাসীর হৃদয়-জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নির্ব্বাচন এত তীব্র হইয়াছিল যে, সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করিলে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, "ডাঃ পট্টভির পরাজয়ে আমার পরাজয় হইয়াছে!"

কেবল তাহাই নহে, তিনি এমন ইঙ্গিতও করিলেন যে, যাহাতে মনে হয়, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগের এখন পদত্যাগ করা সঙ্গত। ইহার ফলে ত্রিপুরীতে কংগ্রেস-অধিবেশনের পূর্ব্বেই প্রাক্তন ওযার্কিং কমিটির সভ্যগণ সুভাষচন্দ্রের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়া পরিপূর্ণ অসহযোগিতা প্রদর্শন করিলেন!

কংগ্রেসের এই জঘন্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ও মহাত্মা গান্ধী-সম্পর্কে—শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিছু-কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল!—

"১৯১৯ এবং তৎপরবর্ত্তী কালে—আজ পর্য্যন্ত, কংগ্রেস বলিতে গান্ধীজী এবং গান্ধীজী বলিতে কংগ্রেসকেই বুঝাইত

এবং বুঝায় ; সুতরাং এই পরাজয়ে উভয়েরই পরাজয় ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তথাপি গান্ধীজী কেন যে 'ব্যক্তিগত পরাভব' শব্দ-সমষ্টির উপর জোর দিয়াছিলেন, তাহাও সহজেই অনুধাবন করিতে পারা যায়।

গান্ধীজীর অভ্রভেদী প্রভাব যে খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে, এই সত্য সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হইয়াছিল।...একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্যতিরেকে এই ভারতবর্ষে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবকে, কোনও দিন কোনও লোকই দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতে সাহস পায় নাই।...সুদীর্ঘকাল পরে একজন শক্তিমান্ ভারতীয় সেই গান্ধীকেই চ্যালেঞ্জ করিয়া বসিল।

চ্যালেঞ্জ করাই ত অপরাধ—যুদ্ধে জয়লাভ করা মহা অপরাধ—অমার্জ্জনীয় অপরাধ! গান্ধী-ভারতবর্ষ যেন বিহারের ভূমিকম্পে আলোড়িত হইয়া উঠিল!...ইদানীং কালের কংগ্রেসে এমন কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ির দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল, একথা আমি অসঙ্কোচে লিখিয়া রাখিতে পারি।"

বিজয়বাবুর এই মন্তব্যের পর আমাদের আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। যা হোক্, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ যখন পদত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্রকে একেবারে অসহায় করিয়া তুলিতেছিলেন, সুভাষচন্দ্র তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী—তাঁহার ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া। কিন্তু এই অবস্থায়ই তিনি ৬ই মার্চ্চ তারিখে 'এম্বুলেন্স্' গাড়ী করিয়া ত্রিপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

অধিবেশনের সময় তাঁহার দেহের উত্তাপ এত বেশী হইল যে, ডাঃ হেনেসী তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া জব্বলপুর হাসপাতালে যাইবার পরামর্শ দিলেন। পণ্ডিত জওহরলালও সুভাষচন্দ্রকে সেই অনুরোধই করিলেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন জাতীয় চিন্তায় উন্মাদ! ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা তাঁহার কাছে তখন তুচ্ছ। দৃপ্ত সিংহের ন্যায় তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আমি জব্বলপুর হাসপাতালে যাইবার জন্য এখানে আসি নাই। অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব্বে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার অপেক্ষা আমি মৃত্যু বরণ করিতে চাই।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সুভাষচন্দ্রের শারীরিক অবস্থা যখন এইরূপ এবং যে অবস্থার সাক্ষীদের মধ্যে ডাঃ হেনেসি এবং পণ্ডিত জওহরলালের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, সেই অবস্থাও গান্ধীজীর অনুবর্ত্তিগণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—তাঁহারা ইহাকে পীড়ার ভান মনে করিয়াছিলেন! এ বিষয়ে বিজয়বাবু বলিয়াছেন :—

"ইহাকে রাজনৈতিক অসুস্থতা বোধে হাসি-ঠাট্টার বিষয়ীভূত করা হইয়াছিল।"

ত্রিপুরী-কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন, তাঁহার সহযোগিতা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন; মোট কথা, তিনি কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হইল না, ব্যক্তিগত

মান-অভিমান ও ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষই যখন জাতীয় ঐক্যবোধকে অভিভূত করিয়া রাখিল, সুভাষচন্দ্র তখন পদত্যাগ করাই সমীচীন মনে করিয়া পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার স্থলে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ !

সুভাষচন্দ্র বুঝিলেন, জাতীয় জীবনের মূর্ত্ত বিকাশ কংগ্রেসকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার যে কল্পনা এতদিন তিনি করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! মহাত্মাজী যতদিন অসহযোগ-আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন, সুভাষচন্দ্র কেবল ততদিনই তাঁহার সহিত মিশিয়া চলিতে পারিতেছিলেন ! কিন্তু মহাত্মাজী ও তাঁহার অনুবর্ত্তী কংগ্রেস এখন আর কোন সংগ্রামের পক্ষপাতী নহেন ; অথচ তিনি নিজে বিশ্বাস করেন, আপোষ-বিহীন সংগ্রাম ব্যতীত কখনও স্বাধীনতা লাভ হইবে না। সুতরাং তিনি নির্জ্জীব ও নিষ্কর্ম্মার ন্যায় বসিয়া না থাকিয়া 'ফরওয়ার্ড ব্লক' (Forward Block) নামে এক সংগ্রাম-পন্থী কর্ম্মিদল গঠন করিলেন।

আজ মনে হয়, ত্রিপুরী-অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে ভূলুণ্ঠিত করিবার জন্য যে সঙ্ঘবদ্ধ জঘন্য আয়োজন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সুভাষচন্দ্রের 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সৃষ্টি এবং অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক কংগ্রেস হইতে তিন বৎসরের জন্য তাঁহাকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা,—এ সমস্তই বুঝি দেশের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল !

কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের স্থান হইল না—সহানুভূতি দূরে থাক্, অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁহার মস্তকে শ্রাবণের ধারার ন্যায় বর্ষিত হইল,—তাই না সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহী-হৃদয় তাঁহার চিরদিনের স্বপ্ন সার্থক করিবার জন্য দূর-দূরান্তে ছুটিয়া গিয়াছিল!

যা হোক্, বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র অনন্তর ১৯৪০ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

জুন মাসে সুভাষচন্দ্র ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। কারণ, হলওয়েল মনুমেণ্ট বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা—নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে দুরপণেয় কলঙ্ক-কালিমায় মণ্ডিত করিয়াছে; সুতরাং এই ঐতিহাসিক অসত্যের অপপ্রচারকে—একটা জাতীয় কলঙ্ককে—ধ্বংস করিবার নিমিত্ত তিনি হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবী করেন, এবং তাহাই ক্রমে এক সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত হয়। সুভাষচন্দ্রের পরম কৃতিত্ব যে, সরকারকে অবশেষে সেই প্রস্তরীভূত জমাট মিথ্যার স্তম্ভকে অপসারিত করিতে হইয়াছে।

এই আন্দোলন সম্পর্কে ২রা জুলাই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মহম্মদ আলী পার্কে বক্তৃতা প্রদান ও ফরওয়ার্ড-ব্লক পত্রিকায় 'হিসাব-নিকাশের দিন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ২৮শে আগস্ট তারিখে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে—হাজতে

অবস্থিতি-কালে, তিনি অভিযুক্ত হন; কিন্তু জেলে তিনি অনশন-ব্রত আরম্ভ করায় ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কারাগারে অবস্থিতিকালে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে, তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, এবং তিনি পুনরায় সগৌরবে কলিকাতা-কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান্‌ও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

তৎপর তাঁহার মুক্তি উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' লিখিয়াছিলেন, "আমরা জানি না কতদিন তিনি কারা-প্রাচীরের বাহিরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। বর্ত্তমান বর্ষের বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা প্রদান করায়, ভারতরক্ষা-আইনের দুইটি অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত; এতদ্ভিন্ন তাঁহার ইংরেজী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় 'হিসাব-নিকাশের দিন' (The Day of Reckoning') শীর্ষক প্রবন্ধের জন্যও তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।"

৫ই ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিলাভ করিয়া সুভাষচন্দ্র কলিকাতা এল্‌গিন্‌ রোড নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সদা-সতর্ক প্রহরীর দল দিন-রাত তাঁহার বাটীর সম্মুখে ও চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিল! তথাপি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সহসা সংবাদ রটিল, তিনি স্বীয় গৃহ হইতে অতি রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন! কলিকাতা পুলিশ-কোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে যে

মোকদ্দমা চলিতেছিল, দিনের পর দিন আজও তাহা কেবলই মুলতুবী রাখা হইতেছে; কারণ, তাঁহাকে আদালতে হাজির করানো সম্ভব হয় নাই।

তিনি নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায়, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এল্‌গিন্ রোডের বাড়ীর অংশ ক্রোক করেন; এবং ক্রোকের ছয় মাসের মধ্যে তিনি উপস্থিত না হওয়ায় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তাহা নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়; কিন্তু নির্দ্ধারিত দিবসে কোন খরিদ্দার উপস্থিত না হওয়ায়, পুনরায় নিলামের দিন ধার্য্য করা হয়। সেদিনও কোন ক্রেতা উপস্থিত হইল না; তখন চব্বিশ-পরগণার কালেক্টর বাহাদুর, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য কমিশনার বাহাদুরের নিকট সমস্ত কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন।

চারি

অন্তর্দ্ধান

অন্তর্দ্ধান—নানা গুজব—সুভাষচন্দ্রের রেডিয়ো-বার্ত্তা—অন্তর্দ্ধানের কারণ—সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন—মহাজাতি-সদনের ইতিহাস—সাময়িক আকর্ষণ—অন্তর্দ্ধানের সর্ব্বপ্রথম বিশ্বাস-যোগ্য বিবরণ।

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী।—

২৬শে জানুয়ারী প্রতি বৎসরই 'স্বাধীনতা-দিবস' নামে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং সেদিনও ছিল জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্মরণীয় দিন; কিন্তু সেই স্মরণীয় দিনে সহসা এক বিস্ময়কর সংবাদে সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল—সকলেই শুনিল, সুভাষচন্দ্র তাঁহার গৃহে নাই!

কোথায় সুভাষচন্দ্র? এল্‌গিন্ রোডের সমস্ত প্রবেশ-পথ, আশে-পাশে চতুর্দ্দিক, সবই যে গোয়েন্দা-বিভাগের নখ-দর্পণে! সুভাষচন্দ্র জেলখানা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গৃহেই আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে তো সম্পূর্ণভাবে মুক্তি নহে! সরকারী অনুগ্রহে তিনি জেলখানায় আবদ্ধ না থাকিয়া, তখন কার্য্যতঃ গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন মাত্র! সুতরাং সি. আই. ডি. বিভাগের গোয়েন্দাগণ তখনও তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখে-চোখে রাখিয়াছিল। হিংস্র শিকারী কুকুরের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি গোয়েন্দাদের সদা-সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া, অসুস্থ সুভাষচন্দ্র

কোথায় যাইতে পারেন? না, তাহা কখনও সম্ভব?—কাজেই সম্ভব-অসম্ভব কত স্থানেই সুভাষচন্দ্রের অন্বেষণ আরম্ভ হইল!

চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারা—তাহার মধ্য হইতে একটা লোক বেমালুম অদৃশ্য হইয়া গেল! এল্‌গিন্ রোডের বাড়ীর ভিতর, বাড়ীর বাহিরে, সমগ্র পাড়ায় এবং অবশেষে সারা কলিকাতায় ও ভারতের সর্ব্বত্র—সুভাষচন্দ্রের অন্বেষণ আরম্ভ হইল; গোয়েন্দা-বিভাগ ও বিশাল পুলিশ-বিভাগ, সকলেই কর্ম্ম-তৎপর হইয়া উঠিল!

পুলিশের পক্ষে, তথা সারা শাসন-যন্ত্রের পক্ষে—ইহা যে কত বড় লজ্জা ও পরাজয়, সকলেই তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিতে পারিল। কিন্তু মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিলেও তখন আর উপায় কি ছিল? সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য যাঁহারা সেই এলগিন্ রোডের বাড়ীতেই অবস্থান করিতে-ছিলেন, তাঁহারা সরকারী পুলিশী লাঞ্ছনার শত আশঙ্কায়ও বিশেষ কোন খবরই দিতে পারিলেন না!

কেবল এইটুকু জানা গেল যে, ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই সুভাষচন্দ্র নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বিশেষ ভাবে সকলকেই তখন জানাইয়া দিয়াছিলেন, কেহই যেন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ না করে; কাহারও নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করিতে পারেন; কিন্তু কখনও কোন কারণেই তাঁহার সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎ হইবে না।

উপরে ঃ সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর জি. ও. সি.র বেশে। **মাঝখানে** (বাঁয়ে) ঃ ক্যাপ্টেন বুরহান উদ্দিন। (ডাইনে) কর্ণেল ভোঁসলে। **নীচে ঃ** জেনারেল মোহন সিং।

আহার্য্য পরিবেষণ সম্পর্কেও কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আহার্য্য লইয়া কেহ ভিতরে আসিবে না,—কক্ষের বাহিরে একটি টেবিলের উপর আহার্য্য রাখিয়া চলিয়া যাইবে, তিনি প্রয়োজন মত নিজেই তাহা আনিয়া লইবেন।

মোট কথা, সুভাষচন্দ্র তাঁহার গৃহমধ্যেই নির্জ্জনে আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, কেবল এইটুকু সংবাদই সংগৃহীত হইল, তাঁহার পলায়নের পন্থা-সম্পর্কে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

সুভাষচন্দ্রের এই রহস্যজনক নিরুদ্দেশের পর কিছুকাল তাঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান আহরণ করা একেবারেই সম্ভব হয় নাই। তবে জনশ্রুতি, বৈদেশিক রেডিয়ো এবং সাংবাদিকগণের নিকট হইতে তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছিল, আজ সেগুলি উন্মাদ জনরব বলিয়া প্রমাণিত হইলেও, কিছু-কিছু এখানে লিপিবদ্ধ হইল।—

অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের বোম্বাইয়ের সংবাদাতা তৎকালে লিখিয়াছিলেন,—

"তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তাঁহার নিজ গৃহে অন্তরীণাবস্থায় ছিলেন। তথা হইতে সহসা একদিন তিনি অন্তর্হিত হন। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া, গরুর গাড়ীতে লুকাইয়া আফগানিস্থানে যান।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্লিণ হইতে বেতার-বক্তৃতা করেন বলিয়া শোনা যায়। উক্ত বৎসরেই তিনি জাপানের টোকিও সহরে উপনীত হন। এই স্থানে জাপানীরা একদল ভারতীয় সৈন্যের সেনাপতি-পদে

তাঁহাকে বরণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। এই সৈন্যদল ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।" *

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ ইউসুফ মেহেরালি বলিয়াছিলেন,—

"যখন দেশে ব্যক্তিগত আইন-অমান্য-আন্দোলন চলিতেছিল, তখন সমগ্র দেশ হঠাৎ এই সংবাদে চমকিত হইয়া উঠিল যে, সুভাষ অন্তর্হিত হইয়াছেন। কেহই জানে না যে তিনি কোথায় আছেন! কেহ কেহ বলেন যে, তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে আছেন—যৌবনের প্রারম্ভেও তিনি একবার অনুরূপ কার্য্য করিয়া-ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি পাতালে গমন করিয়াছেন! আবার কাহারও মত,—তিনি কোন বৈদেশিক রাজ্যে পলায়ন করিয়াছেন! সুভাষ কোথায়? জনরব তাঁহাকে একই সময়ে কলিকাতা, রেঙ্গুণ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, মস্কো, বার্লিণ, রোম, টোকিও প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিল।"

রয়টার এইসঙ্গে কিছু যোগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র জার্ম্মাণীতে যাইয়া হিট্‌লারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। হিট্‌লার তখন সুভাষকে 'ফুরার অব্ ইণ্ডিয়া' ('Fuhrer of India') নামে সম্বোধন করিয়াছিলেন। পরে জানা গিয়াছে যে, সুভাষ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করিয়া তাহার সর্ব্বাধ্যক্ষ-রূপে স্বাধীন ভারতে প্রবেশ করিবেন।

* "In 1942, he was reported broadcasting from Berlin and later in that year, he appeared in Tokyo, when the Japanese promised to put him at the head of the Army of Indians ready to march back into India and drive the British out."—*Ibid*, P. 442(g).

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ একদিন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল সুভাষচন্দ্রের নিজের কথায়। তিনি একদিন রেডিয়ো-বার্ত্তায় ঘোষণা করিলেন,—

"বিগত ২০০ বৎসরের বৈদেশিক ইতিহাস আমি গভীর অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিয়াছি—বিশেষতঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু কোথাও বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকে কোন দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, এইরূপ একটি দৃষ্টান্তও পাই নাই; এবং ব্রিটেনও শুধু যে স্বাধীন জাতির সাহায্য গ্রহণ করিতেছে এমন নয়, পরন্তু ভারতের মত পরাধীন দেশের সাহায্যও গ্রহণ করিতেছে। যদি ব্রিটেনের সাহায্য ভিক্ষায় কোন দোষ না থাকে, তবে সাহায্য গ্রহণে ভারতের পক্ষে তো কোন দোষই নাই; এবং আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যই সাদরে বরণ করিব।"*

সুভাষচন্দ্রের এই রেডিয়ো-বার্ত্তায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, স্বাধীনতার উদগ্র নেশায় উন্মাদের ন্যায় আত্মহারা হইয়া, বিপদ্-সঙ্কুল বিশ্বের পথে অতি রহস্যজনক ভাবে তিনি যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল, বিদেশী শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়নের আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু পরাধীন দেশের এক পলাতক বন্দীর পক্ষে এমন আকাঙ্ক্ষা—ইহা কি স্বপ্ন নহে?

* "If there is nothing wrong in Britain begging for help, there can be nothing wrong in India accepting an offer of assistance which she needs, and we shall welcome any help in India in our struggle against British Imperialism."—*Ibid*, P. 442(r).

হয়তো স্বপ্ন—যথার্থই স্বপ্ন! কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁহার সারাজীবনই যে এরূপ স্বপ্ন দেখিয়া কাটাইয়াছেন! তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—

"ওরা বলে, আমি স্বপনচারী। আমি স্বীকার করছি, আমি স্বপনচারীই বটে। সারাজীবন আমি স্বপ্ন দেখেছি; শিশুকাল থেকেই এ আমার এক রোগ। কত স্বপ্নই না আমি দেখেছি! কিন্তু আমার স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন—আমার জীবনের সব চাইতে প্রিয় স্বপ্ন—ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন!"

১৯৩৭ সালে—সুভাষচন্দ্র যখন স্বাস্থ্যলাভার্থ ডালহৌসী পাহাড়ে অবস্থান করিতেছিলেন, আমরা জানি, তখনও তিনি একবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন! সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয় তখন ডক্টর ধরমবীরের অতিথি।

সুভাষচন্দ্র সেই সময় একদিন বিজয়বাবুকে যাহা বলিয়াছিলেন, স্বপ্ন হইলেও, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কাউকে এখনও বলিনি, আজ আপনাকেই প্রথম বলছি, কলকাতার আমার একটা কংগ্রেস-ভবন গড়বার ইচ্ছা আছে। 'কংগ্রেস হাউস্' নাম হলেও তাতে শুধু যে কংগ্রেসের কাজই হবে, তা নয়! আসলে হবে সেটা জাতীয় বাহিনীর প্রধান শিবির! তার সঙ্গে থাকবে লাইব্রেরী, ষ্টেজ, জিমনেসিয়াম; কংগ্রেস-অফিসও থাকবে বটে; কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ সৈনিক-কেন্দ্র হবে। অনেক দিন থেকেই প্ল্যানটা মাথায় আছে, এইবার কলকাতায় গিয়ে কাজ আরম্ভ করবো।"*

---

* আজাদ-হিন্দের অঙ্কুর (শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

কাজ তিনি আরম্ভও করিয়াছিলেন—তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে তিনি উদ্যোগীও হইয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নে-দেখা এই রকম একটি জাতীয় ভবনের কথা আলোচিত হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন বার্ষিক একটাকা মাত্র খাজনায়, চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর অবস্থিত বৃহৎ একখণ্ড ভূমি সুভাষচন্দ্রকে প্রদান করেন। কিন্তু জমি পাওয়া গেলেই তো প্রাসাদ নির্ম্মাণ সম্ভব হয় না! সুতরাং সুভাষচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ভক্তগণ—যাঁহারা কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে ছিলেন—তাঁহারা নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য কর্পোরেশন হইতে একলক্ষ টাকা অর্থ-সাহায্যও মঞ্জুর করাইয়াছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা সমাপ্ত হইল ঐখানেই! ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসের বাঁশী তখনও করুণ সুরে বাজিয়া যাইতেছিল! ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয়ে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং পরাভব স্বীকার করিয়া এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে একে-একে নিজের কোলে টানিয়া লইয়া নব-নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে হস্তপদ-বিহীন 'ঠুঁটো জগন্নাথে' পরিণত করিয়াছিলেন! আর রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র তখন পুনঃ পুনঃ কংগ্রেসের ঐক্য-সাধনের চেষ্টা করিয়া, অবশেষে হতাশ হইয়া, পদত্যাগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

দেশের আবহাওয়া তখন এইরূপ—বাংলা ও বিহারের দ্বন্দ্ব, প্রাচীন ও তরুণের দ্বন্দ্ব। কিন্তু প্রাচীন ও তরুণের এই দ্বন্দ্বে,

জগৎ স্বভাবতঃই প্রাচীনের চরণে শ্রদ্ধানত হইয়া পড়ে; সুতরাং কর্পোরেশনেও অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিল। শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু লিখিয়াছেন ঃ—

"কর্পোরেশনে একদল লোক ধুয়া ধরিয়া ফেলিল। বলিল, রাধাও নাচিবে না, তেলও পুড়িবে না, অর্থাৎ লক্ষ টাকায় জাতীয় ভবনও হইবে না, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীও হইবে না,—টাকাগুলি গান্ধী-মারণ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতেই শেষ হইয়া যাইবে।"

সুতরাং তাহারা আইনের প্যাঁচে ফেলিয়া কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে আটকাইয়া ফেলিলেন, আর শেষ মুহূর্ত্তে আসিল হাইকোর্টের ইঞ্জাংশন্! কাজেই লক্ষ টাকার চেক্ আর কোনদিনই সুভাষচন্দ্রের হস্তগত হইল না—আর তাহার ফলে সেই কংগ্রেস-ভবন বা জাতীয় ভবন—গুরুদেবের প্রদত্ত নামে যাহা 'মহাজাতি-সদন' নামে পরিচিত হইয়াছিল,—আজও তাহা অসমাপ্ত ও অবজ্ঞাত অবস্থায় কলিকাতা মহানগরীর বুকে জাতীয় ঈর্য্যা-বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের মূর্ত্ত সাক্ষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান!

বিগত যুগের 'মহাজাতি-সদনের' এই মর্ম্মভেদী করুণ ইতিহাস এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সুভাষচন্দ্র চিরদিনই কত স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছেন!

বাংলার বুকে একটা জাতীয় ভবন হইবে, জাতীয় বাহিনী গড়িয়া উঠিবে, সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র হইবে, ইহাই না তাঁহার সেদিনের স্বপ্ন ছিল?

১৯২৮ সালেও বুঝি সুভাষচন্দ্র এমনই এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন! সেবার কলিকাতায়ই ছিল কংগ্রেসের অধিবেশন, আর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।

জানিনা, সুভাষচন্দ্র সেদিনও কোন সামরিক চিত্র বা জাতীয় বাহিনীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কি না! সম্ভবতঃ সেরূপ কোন স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি সেদিন কংগ্রেস-মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়ক-রূপে! তাঁহার সুদর্শন বলিষ্ঠ বপু সেদিন তরুণের অগ্রদূত-রূপে সকলের চক্ষুর সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল!

কিন্তু হতভাগ্য সুভাষচন্দ্র! সেদিনও তিনি ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের হীন মন্তব্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছা-সেবক-বাহিনীর 'জেনারেল-অফিসার-কম্যাণ্ডিং' বা G. O. C. নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই পদ-মর্য্যাদার অপভ্রংশ 'গরু' (GOC) শব্দটিকে লইয়াই কত না ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হইয়াছিল! এমন কি মহাত্মা গান্ধীও সেদিন তাহাতে হীন দৌর্ব্বল্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন!

"স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর ও বাহিনীর অধিনায়কের যোদ্ধবেশ ও যোদ্ধাসম্ভব কুচকাওয়াজ দর্শনে সার্কাসের অভিনয়ের সহিত ব্যঙ্গাত্মক তুলনা গান্ধীজীই করিয়াছিলেন।"*

কিন্তু যিনি যতই তুলনা করুন বা যিনি যতই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করুন না কেন, আজ পৃথিবীতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে

* আজাদ-হিন্দের অঙ্কুর।

যে, সুভাষচন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেন বটে, কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবার উদগ্র প্রচেষ্টাও তাঁহার ছিল।

সামরিক চিত্র যে তাঁহার কত আকাঙ্ক্ষিত, সে বিষয়ে তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়বাবুর নিকট কথা-প্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দাদা, সামরিক বেশভূষা ও আদব-কায়দার ওপর আমাদের মত দুর্ব্বল, নিরস্ত্র ও পরাধীন দেশের লোকদেরও যে কতখানি সম্ভ্রম ও সমীহ, তা বোধহয় আপনারা কল্পনা করতেও পারেন না। অন্যে পরে কা কথা! মহাত্মা গান্ধী যখন সামনে দিয়ে যান, তখন লোকের মনে শুধু ভক্তিই জেগে ওঠে, পায়ের ধুলো নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় —এই মাত্র! কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী যখন নিয়মবদ্ধ সারিবদ্ধ হয়ে কদমে-কদমে চলে যায়, তখন জনতা দু'ধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে কি ভাবে, জানেন? ভাবে, আমিও কেন স্বেচ্ছাসেবক হই নি? হোলে আমিও ত অমনি বীরদর্পে কদমে-কদমে হাঁটতে পারতুম! দাদা, এর মূল্য আমার কাছে অনেক—অনেক; অমূল্য, মহামূল্য!"

কথাটা খুবই সত্য, আমরাও তাহা স্বীকার করি। স্বাধীন ভারতের সামরিক চিত্রই যদি তাঁহার সম্মুখে স্বর্ণ-কিরীটী নবারুণের উজ্জ্বল বিভায় ফুটিয়া না উঠিত, তাহা হইলে কি এমন উন্মাদের মত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, চূড়ান্ত বিপদের ঝুঁকি কাঁধে লইয়া, রাষ্ট্রশক্তিকে ফাঁকি দিবার জন্য তিনি মারাঠা-বীর চতুর শিবাজীর অভিনয়ে সাহসী হইতেন?

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান-কাহিনী, স্বাধীনতার জাতীয় ইতিহাসে চিরদিনই রক্ত-অক্ষরে লিখিত থাকিবে, আর

উপরে ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝান্সির রাণী রেজিমেণ্টের কতিপয় নারী ভলান্টিয়ার। **মাঝখানে ঃ** নেতাজী সুভাষচন্দ্র। **নীচে ঃ** নেতাজী ও ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী নারী-সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণ দায়িত্বশীল পুলিশ কর্ম্মচারীদের স্মৃতিপটে ইহা গভীর কলঙ্ক ও ব্যর্থতার ইতিহাস-রূপে চিরদিনই তাহাদিগকে নির্ম্মম কশাঘাত করিবে!

নিরুদ্দিষ্ট সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কিছুকাল নানা জনরব ও নানা গবেষণাই চলিতেছিল; কিন্তু কেমন করিয়া, কোন্ উপায়ে তিনি তাঁহার প্রহরী-বেষ্টিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, অনেক-কিছু সে সম্পর্কে প্রচারিত হইলেও, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—সুভাষচন্দ্রের নিজ মুখ হইতে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরিপূর্ণ বিবরণ যদি কখনও শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হয়, তবে তাহাই হইবে প্রামাণ্য; এবং তাহা এতাবৎকালে প্রকাশিত যাবতীয় বিবরণ, এমন কি,—অনেক চমকপ্রদ গোয়েন্দা-কাহিনীর শিহরণ এবং কৌতূহলকেও তুচ্ছ ও নিষ্প্রভ করিয়া দিবে!

সুবিখ্যাত আকালী নেতা, মাষ্টার তারা সিং তাঁহার "শান্ত্ সিপাহী" নামক মাসিক কাগজে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান-সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ।

তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ-সংবাদ ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার এল্‌গিন্ রোডের গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন তাহার বহু পূর্ব্বে,—১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে।

সম্ভবতঃ তিনি তাহারও অনেকদিন আগে হইতেই পলায়নের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে নির্জ্জন

সাধনায় অবস্থানের ছলে, লোক-লোচনের অন্তরালে কক্ষমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার শ্মশ্রু ও কেশরাশি সুদীর্ঘ হইবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং ১৩ই ডিসেম্বর যখন তিনি পেশোয়ারী পোষাকে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তাঁহার সুদীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু-রাশিতে তাঁহাকে যথার্থই পেশোয়ারী বলিয়া মনে হইতেছিল!

এইরূপ ছদ্মবেশে তিনি একখানি মোটরযোগে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যান; সেখানে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত অনুসারে তিনি ট্রেণে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে আরোহণ করিয়া পেশোয়ার গমন করেন।

পেশোয়ার হইতে তিনি কাবুল চলিয়া যান, এবং সেখান হইতে দৈবযোগে সুবিধা পাইয়া বিমানে তিনি বার্লিণে হিটলারের দরবারে উপস্থিত হন।

মাষ্টার তারা সিংএর এই বিবরণ যে আংশিক সত্য, তাহা কাবুলের এক বেতার-যন্ত্র ব্যবসায়ী—লালা উত্তমচাঁদের লিখিত বিবরণেও অনেকটা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত বিবরণে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব।

পাঁচ

অন্তর্দ্ধানের বিবরণ

মৌলবীর বেশে মোটরে—ট্রেণে পেশোয়ার—সঙ্গী রহমৎ খাঁ—জামরুদের পথে—'গাঢ়ি' গ্রামে—লালপুরা—কাবুল-নদী অতিক্রম—'ঠাণ্ডী'তে বাসের অপেক্ষায়—লাহোরী-দরওয়াজা—এক সরাইখানায়—সি. আই. ডি.র পাল্লায়।

মাষ্টার তারা সিং বলিয়াছেন—সুভাষচন্দ্র ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন; কিন্তু লালা উত্তমচাঁদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় সুভাষচন্দ্রের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার তারিখ ১৫ই জানুয়ারী অর্থাৎ তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সংবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত হইবার ১১ দিন পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে রাত্রি ৮টার সময় তাঁহার এলগিন রোডের বাড়ী হইতে একজন মুসলমান মৌলবীর বেশে বাহির হইয়া, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত অনুসারে একখানি মোটর-গাড়ীতে আরোহণ করেন।

গোয়েন্দা-পুলিশের ব্যূহ ভেদ করিয়া গাড়ী নক্ষত্র-বেগে ছুটিয়া চলিল। তাঁহাকে কেহ দেখিল, কেহ দেখিল না; কিন্তু সন্দেহ করিল না কেহই। কারণ, সুভাষচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাঁহার গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজি সুদীর্ঘ করিবার সুযোগ লইয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে চল্লিশ মাইল দূরে এক রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে মোটরে চলিয়া যান। তারপর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট—পেশোয়ার পর্য্যন্ত—কিনিয়া লইয়া তিনি ট্রেণে উঠিয়া বসেন।

রাত্রিটা বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল; কিন্তু পরদিন একজন শিখ আরোহী ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া, সুভাষচন্দ্রের প্রায় মুখোমুখি হইয়া বসিলেন।

কয়েকবার বেশ তীক্ষ্ণভাবে সুভাষচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইতেছেন? আর কি আপনার পরিচয়?"

সুভাষচন্দ্র কহিলেন, "আমার নাম জিয়াউদ্দিন, আমি একজন জীবন-বীমা কোম্পানীর অর্গানাইজার। আমি লক্ষ্ণৌ হইতে আসিতেছি, রাওয়ালপিণ্ডি যাইব।"

শিখ ভদ্রলোক তাঁহার সেই কৈফিয়ৎ শুনিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিলেন কিনা, কে জানে? যাহা হউক, সুভাষচন্দ্র অনেকটা সন্ত্রস্তভাবেই রহিলেন; এবং গাড়ী যখনই কোন ষ্টেশনে উপস্থিত হইতেছিল, সুভাষচন্দ্র জনতার দৃষ্টি হইতে নিজেকে যথাসাধ্য গোপন করিবার জন্য, সংবাদপত্র পড়িবার ছলে, তাহারই পশ্চাতে নিজের মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিতেছিলেন।

এইভাবে বাকি পথটা কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৭ই জানুয়ারী রাত্রি ৯টার সময় তিনি পেশোয়ার পৌঁছিলেন।

পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত অনুসারে একখানি মোটরগাড়ী তাঁহার জন্য

ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল ; তিনি ষ্টেশনে পৌঁছিলেই গাড়ীখানি তাঁহাকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের দিকে ছুটিয়া চলিল।

এই সময় সুভাষচন্দ্রের বেশভূষা ছিল, একটি আঁটা পায়জামা, একটি শেরওয়ানী ও ফেজটুপী। মোট কথা, তাঁহাকে দেখিয়া একজন মৌলবী ব্যতীত আর কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না।

পেশোয়ারে তাঁহাকে দুইদিন অবস্থান করিতে হইল। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বন্ধুবান্ধবগণ এরূপ সাবধানেই তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন যে, কেহই কোন সন্দেহ করিতে পারিল না। অনন্তর তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, "এখন কাবুল যাইতে হইলে, পেশোয়ার হইতে তাঁহার কোন্ বেশে যাওয়া উচিত হইবে ?"

স্থির হইল, যুক্তপ্রদেশের মৌলবীর সাজ এখন আর সুবিধাজনক হইবে না। আফগানিস্থানে যাতায়াত করিতে পাঠান বেশভূষাই স্বাভাবিক ও সহজ। সুতরাং ১৯শে জানুয়ারী তারিখে, যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে সুভাষচন্দ্র পাঠানের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন।

পূর্ব্বেই ঠিক ছিল, নওজোয়ান ভারত-সভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভগৎরাম ও অপর একজন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। সুতরাং জিয়াউদ্দিনের সহচর-রূপে তাঁহাদেরও মুসলমান এবং পাঠান হওয়া সঙ্গত। কাজেই তাঁহারাও পাঠানী পোষাকে সজ্জিত হইলেন, এবং ভগৎরামের নূতন নাম হইল, রহমৎ খাঁ।

এইভাবে সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম, উভয়েই ছদ্মবেশে—

জিয়াউদ্দিন ও রহমৎ খাঁ নাম ধারণ করিয়া অপর এক বন্ধুর সহিত মোটরে চড়িয়া বসিলেন; মোটরও তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে লইয়া পেশোয়ার পরিত্যাগ করিয়া জামরুদের পথে কাবুলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

জামরুদ কেল্লা তাহার অনতিদূরেই। পাছে ধরা পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় তাঁহারা ঠিক্ সেই পথে না যাইয়া, একটা কাঁচা রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। কিন্তু 'গাঢ়ি' নামে এক গ্রামে আসিয়াই তাঁহাদের রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল, মোটর চলিবার মত রাস্তা ইহার পরে আর নাই।

অগত্যা সকলকেই নামিতে হইল, এবং রহমৎ ব্যতীত অপর যে বন্ধুটি পেশোয়ার হইতে এতটা পথ তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি এইখান হইতে মোটর লইয়া পুনরায় পেশোয়ারে ফিরিয়া গেলেন। স্থির হইল, সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁ দুইজন রাইফেলধারী পাঠান প্রহরীসহ পদব্রজে অগ্রসর হইবেন। আর ইহাও স্থির হইল যে, সুভাষচন্দ্র এখন হইতে বোবা ও কালার অভিনয় করিয়া যাইবেন! কারণ, সেদেশী ভাষায় তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ!

পরদিন তাঁহারা ভারত-সীমান্ত পার হইয়া গেলেন এবং পার্ব্বত্য জাতি-সমূহের এক ক্ষুদ্র গ্রামে—আদ্দা-শরীফের তীর্থস্থানে উপস্থিত হইলেন। আদ্দা-শরীফের মসজিদে যে পীরসাহেব ছিলেন তিনি তাঁহাদের সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

এই সময় তাঁহাদের সঙ্গী প্রহরী দুইজন চলিয়া গেল,

তৎপরিবর্তে অপর তিনজন সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাদের সঙ্গী হইল। পরদিন পুনরায় যাত্রা সুরু হইল এবং রাত্রি প্রায় ৯টার সময় যেস্থানে পৌঁছিলেন, তাহার নাম লালপুরা।

লালপুরায় আসিবার ব্যবস্থা তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদনুসারে তাঁহারা লালপুরার সর্দ্দার ও জমিদার, প্রকাণ্ড এক খাঁ-সাহেবের অতিথি হইলেন। আফগান-সরকারে এই খাঁ-সাহেবের ক্ষমতা ছিল অসীম।

কঠোর পথশ্রমে ও উদ্বেগে সুভাষচন্দ্র এই সময় রীতিমত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খাঁ-সাহেব তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর সামান্য কয়েক মাইল গেলেই আপনারা কাবুল-নদীর তীরে উপস্থিত হইবেন। সে নদী পার হইলেই ওপারে বাঁধানো রাস্তা পাওয়া যাইবে। সেই পথে বাস-চলাচল করে; তাহারই কোন বাসে চাপিয়া আপনারা কাবুলে পৌঁছিতে পারিবেন।"

লালপুরা পরিত্যাগ করিবার কালে তিনি সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁকে একটি পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "পথে কেউ আপনাদের কোন সন্দেহ করিলে বা কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিলে এই পরিচয়-পত্র দেখাইবেন—তাহা হইলে কেহই আর কোন বাধা সৃষ্টি করিতে সাহস পাইবে না।"

পরিচয়-পত্রখানি পারসী ভাষায় লেখা। তাহাতে লিখিত ছিল :—

"এই পত্র-বাহক রহমৎ খাঁ ও জিয়াউদ্দিন পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী। ইঁহারা সাখি-সাহেবের দরগায় যাইতে-

ছেন। ইঁহাদের চরিত্রের জন্য আমি নিজে দায়ী। কেহই যেন ইহাদিগকে কোনভাবে বিরক্ত করিতে না পারে, এই ভরসায় আমি এই সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতেছি।”

লালপুরা হইতে দুইটি সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে লইয়া সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁ কাবুলের পথে, কাবুল নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কাবুল-নদীর তীরে পৌঁছিয়া তাঁহারা একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। কারণ, নৌকা—নৌকা কোথায়? নৌকার কোন চিহ্নও সেখানে নাই। এক অপরূপ উপায়ে সেদেশে সকলে পারাপার হইয়া থাকে!

কতকগুলি ভিস্তির মশক একসঙ্গে বাঁধিয়া তাহার উপরে জেলেদের একখানি জাল বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পারাপারের সময় লোকজন ঐ জালের উপর বসিয়া থাকে।

সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ ইহাতে অভ্যস্ত নহেন; সুতরাং এই বন্দোবস্তে তাঁহারা প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন। যাহা হউক, সাহসে নির্ভর করিয়া অগত্যা ঐ ভাবেই তাঁহাদিগকে কাবুল-নদী অতিক্রম করিতে হইল।

কাবুল-নদীর পরেই আফগান-রাজ্য। আফগান-রাজ্যের প্রবেশ-পথে পদে-পদে অসংখ্য বাধা। কেহ সেখানে সশস্ত্র ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং নদীর অপর তীরেই সশস্ত্র প্রহরী দুটিকে তাঁহাদের বিদায় দিতে হইল। ইহা ছাড়া, এখানে-সেখানে খানাতল্লাসীর বন্দোবস্তও রহিয়াছে; কিন্তু খানাতল্লাসীর কোন ব্যাপারই তাঁহাদের পক্ষে নিরাপদ নহে।

আজাদ ফৌজের কতিপয় বামদিক হইতে প্রথমে রেব সন, তৃতীয় সিপ্রা সেন, পঞ্চম মিস্ ভট্টাচার্য্য কর্ণেল লক্ষ্মী ।

সুভাষচন্দ্র তখন ছদ্মবেশে জিয়াউদ্দিন; রহমৎ খাঁও প্রকৃতপক্ষে ভগৎরাম। সুতরাং দুইটি ছদ্মবেশী লোকের পক্ষে কি খানাতল্লাসীর সম্মুখীন হওয়া চলে? কাজেই তাঁহারা চিন্তিত হইলেন।

পেশোয়ার হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামের নাম 'ডাকা'। 'ডাকা'য় তল্লাসীর হিড়িকটা খুব বেশী, অবশ্য মাঝপথে—পেশোয়ার ও ডাকার মাঝখানেও কয়েক স্থানে যাত্রীদিগকে তল্লাসী করা হয়। সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম অনেকটা ঘুরপথে চলিতেন, অনেকটা বেশী পথ হাঁটিতেন, তথাপি তাঁহারা সহজে খানাতল্লাসার সম্মুখীন হইতেন না।

'ঠাণ্ডী' নামক এক জায়গায় আসিয়া তাঁহারা কাবুল যাইবার জন্য বাসের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুভাষচন্দ্র ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহে এক গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আর রহমৎ খাঁ যখনই যে বাস্ দেখিতে-ছিলেন, তখনই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য হাত নাড়িতেছিলেন।

বহু চেষ্টায়, অবশেষে এক লরীতে তাঁহাদের স্থান হইল—তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন।

জানুয়ারী মাস—শীত তখন নিদারুণ। বিশেষতঃ আফগান-রাজ্যের সেই শীত,—তাহার কল্পনা করাও কঠিন! সারা মাঠ তখন তুষারে সাদা হইয়া গিয়াছে! তবু—তাহারই মধ্য দিয়া, সেই তুষার-রাজ্য ভেদ করিয়া, সারা দিন, সারা রাত লরী ছুটিয়া চলিল।

শীতে তাঁহাদের হাত-পা জমিয়া যাইবার মত হইল—তাঁহারা মাঝে-মাঝে চা পান করিয়া দেহের রক্ত উষ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

দ্বিতীয় দিন তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাহার নাম 'বাট্‌খাক্'। এখানে যাত্রীদের পাসপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়, তাহাদিগকে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁকে অনুরূপ ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে, রহমৎ খাঁ বলিলেন, "ইনি আমার বড় ভাই; ইনি কালা ও বোবা। আমি ইঁহাকে লইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য সাখি-সাহেবের দরগায় যাইতেছি। আমরা স্বাধীন পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী।"

এই বলিয়া তিনি লালপুরার খাঁ-সাহেবের দেওয়া সেই সার্টিফিকেটখানা দেখাইলেন। সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্নকর্ত্তা একেবারে নীরব হইয়া গেলেন।

সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁ অনন্তর সেইখানে কিছু চা পান করিয়া পুনরায় লরীতে উঠিলেন, লরীও আবার পূর্ণ বেগে ছুটিয়া চলিল।

অপরাহ্ণ ৪টা কি ৫টার সময় লরী আসিয়া থামিল আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল সহরে। তাঁহারা এইখানে নামিয়া পড়িলেন এবং লরীওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া মিটাইয়া দিলেন।

আফগান-রাজ্যে ভারতবর্ষীয় মুদ্রার প্রচলন নাই। সুতরাং পেশোয়ার হইতেই তাঁহাদিগকে আফগানী মুদ্রার ব্যবস্থা

করিতে হইয়াছিল। নতুবা আফগানিস্থানে আসিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইত।

সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁ কাবুলে আসিলেন বটে, কিন্তু কাবুল হইলেও ইহা কাবুলের একটা সীমান্ত-অংশ মাত্র। ইহার নাম 'লাহোরী-দরওয়াজা'।

এক উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর লাহোরী-দরওয়াজা অবস্থিত। বাস ও লরীর ড্রাইভারগণ এইখানে আসিয়া, তাহাদের বাস ও লরীতে নির্দ্দিস্ট সংখ্যার অতিরিক্ত আরোহী থাকিলে তাহাদিগকে নামিয়া যাইতে বলে, এবং এই ভাবে তাহারা পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়।

সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁ এইখানে নামিলেন; কিন্তু নামিয়া এখন তাঁহারা কোথায় যাইবেন? একটা আশ্রয় চাই তো! নিকটে কোথায়ও আশ্রয়-স্থান আছে কি না, তাহা কে জানে? রহমৎ খাঁ বাজার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে অদূরে একখানি বাড়ী দেখাইয়া কহিল, "ঐ একটা সরাই আছে। খুঁজিয়া দেখিতে পার সেখানে কোন জায়গা খালি আছে কিনা।"

সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁ একটু হাঁটিয়া গিয়া সেই সরাইখানায় উপস্থিত হইলেন। রহমৎ পুস্তভাষায় একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে একটু আশ্রয় পাইতে পারি কি?"

লোকটি পুস্তভাষা বুঝিল না। কিচির-মিচির করিয়া

ক্রুদ্ধ ভাবে কি জবাব দিল! আফগানীদের মাতৃভাষা যে পুস্তু নহে, এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতা হইল। ইতোমধ্যে আর একটি লোককে দেখিতে পাইয়া রহমৎ তাহাকেও পুস্তু ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, আপনি বলিতে পারেন, এই সরাইএর মালিক কে? আমরা আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি।"

ভাগ্যক্রমে সে তাঁহার পুস্তুভাষা বুঝিল। সে দূরে একখানি ঘর দেখাইয়া কহিল, "ঐখানে সরাইয়ের চৌকীদার আছে; আপনারা তাহার কাছে যান, সে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।"

সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ তখন সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গুর্খা-ধরণের একটি লোক দিব্যি লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া আছে।

রহমৎ তাহাকে আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে উঠিয়া আসিল এবং একখানি ক্ষুদ্র কক্ষ দেখাইয়া কহিল, "আপনারা এইখানে থাকিতে পারেন। এক টাকা করিয়া ভাড়া লাগিবে।"

কক্ষটি অতি ক্ষুদ্র ও জানালা-দরজা শূন্য। দরজা বন্ধ করিয়া দিলে তাহা গুদামে পরিণত হইয়া যায়। তবু তাহাই তখন তাঁহাদের নিকট স্বর্গ বলিয়া মনে হইল! তাঁহারা সেইখানেই নিজেদের জিনিষ-পত্র আনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

সেই সরাইটির প্রধান অধিবাসী ছিল কতকগুলি উট,

খচ্চর ও গাধা-ঘোড়া এবং তাহাদের সহিসদের দল। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম ওরফে রহমৎ খাঁকেও আজ সেইখানেই আশ্রয় লইতে হইল।

দিন পাঁচ-ছয় ভাল ভাবেই কাটিয়া গেল। ইহার পরে একদিন রহমৎ আসিয়া সুভাষচন্দ্রকে কহিলেন, "সাদা পোষাকে একটা লোক কাছেই রুটির দোকানে বসিয়া থাকে। সে সর্ব্বদাই আমার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকায়। তাহাকে দেখিয়া আফগান সি. আই. ডি.র লোক বলিয়া মনে হয়।"

কথার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই কনষ্টেবলটি তাঁহাদের দরজার সম্মুখে উদয় হইল।

সে এক মুহূর্ত্ত তীক্ষ্ণভাবে তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর পরিচিত পুস্তভাষায় সতেজে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে? আর এখানে আসিয়াছেন কেন?"

রহমৎ খাঁ সুভাষচন্দ্রকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইনি আমার বড় ভাই, বোবা ও কালা, এবং অসুস্থ। আমি ইঁহাকে লইয়া সাখি-সাহেবের দরগায় যাইতেছি; কিন্তু অতিরিক্ত তুষারপাত হওয়ায়, সাখি-সাহেবের পথ-ঘাট এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমরা এখানে অপেক্ষা করিতেছি।"

কনষ্টেবলটি কহিল, "আপনাদের কথা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। যাহোক, আপনারা আমার সঙ্গে কোতোয়ালীতে চলুন।"

সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁর সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিল। তাঁহারা ভাবিলেন,—এত পরিশ্রম, এত যত্ন, সবই কি বিফল

হইল? যাহোক, রহমৎ খাঁ যেন খানিকটা গরম হইয়াই কহিলেন, "বেশ, চলুন আমি যাইতেছি; কিন্তু আমার দাদা খুবই অসুস্থ, তিনি যাইতে পারিবেন না।"

কনষ্টেবলের গলার স্বর কতকটা নরম হইয়া গেল; সে ভাবিল, "সত্যই তো একটা রুগ্ন লোককে থানায় লইয়া গেলে কি লাভ হইবে? বরং তাহা না করিয়া যদি—"

সে কহিল, "বেশ, তাহা হইলে থাক্, কাহারও যাইবার দরকার নাই। কিন্তু সাবধান, খুব শীগ্‌গির এখান হইতে চলিয়া যাইবেন—ইহার যেন অন্যথা না হয়। তবে—যাওয়ার আগে চা খাওয়ার জন্য আপনারা আমাকে কিছু দিয়া যান—যে শীত পড়িয়াছে!"

রহমৎ খাঁ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার হাতে একখানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। কনষ্টেবলটি চায়ের দক্ষিণা, সেই নোটখানি লইয়া আনন্দের সহিত চলিয়া গেল।

সেদিন চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তিন দিন পরেই আবার সে আসিয়া উপস্থিত। সেদিনও তাহাকে দক্ষিণা বাবদ পাঁচটি টাকা দিয়া বিদায় করিতে হইল।

সুভাষচন্দ্র এবং রহমৎ বুঝিলেন, পুলিশের এই ভূতটি তাঁহাদের কাঁধে এখন জোঁকের মত আঁটিয়া থাকিবে! এখন ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় কি, তাঁহারা ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রহমৎ খাঁ অর্থাৎ ভগৎরামের নিকট সুভাষচন্দ্র শুনিয়াছিলেন যে, কাবুল শহরে উত্তমচাঁদ নামে একজন রেডিয়ো-

ব্যবসায়ী আছেন। তিনি এক সময় নওজোয়ান ভারত-সভার জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন এবং সেই সংশ্রবে ১৯৩০ সালে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তারও করিয়াছিল।

সুভাষচন্দ্র ইহা শুনিয়া ভাবিলেন, দেশের কাজে যাঁহারা একবার পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দান করা অসম্ভব না হইতেও পারে। সুতরাং তিনি রহমৎ খাঁ অর্থাৎ ভগৎরামকে কহিলেন, "আপনি একবার সেইখানে যান, দেখুন তিনি আশ্রয় দিতে রাজী হন কি না!"

সুভাষচন্দ্র বলিলেন বটে, কিন্তু রহমৎ খাঁ তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন! তিনি ভাবিতেছিলেন, "কি জানি, উত্তমচাঁদ যদিই বা কোন সাহায্য না করেন!"

এই ভাবে হয়তো আরও কিছুকাল কাটিয়া যাইত, কিন্তু পরদিন যখন সেই সি. আই. ডি. কর্ম্মচারীটি আবার দেখা দিল, তখনই ব্যাপারটা খুব জরুরী হইয়া উঠিল।

পুলিশ-কর্ম্মচারীটি কহিল, "খাঁ সাহেব, আপনারা এখনো এখানে আছেন? দেখুন আপনাদের সম্পর্কে আমার এখন নানা রকম সন্দেহ হইতেছে। আমি আজ আমার দারোগা-সাহেবের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলিয়াছিলাম; তিনি আপনাদিগকে থানায় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কাজেই চলুন, এখনই একবার থানায় যাইতে হইবে। আপনার দাদাটি বোবা-কালা হইলেও একটুখানি হাঁটিতে না পারিবার কোন কারণ নাই।"

রহমৎ খাঁ বলিলেন, "নিতান্ত দরকারী মনে করেন তো আমি যাইব; কিন্তু আমার দাদা অসুস্থ, তাঁহাকে কেন কষ্ট দিবেন?" এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ টাকার নোট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

কনষ্টেবল সেই নোটখানি পকেটে রাখিতে-রাখিতে বলিল, "না, না, ওসব দু'পাঁচ টাকার ঘুষ আমি গ্রহণ করি না। চলুন, থানায় চলুন!"

রহমৎ খাঁ পুনরায় একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিলেন এবং পুলিশটিকে তাহা দিলেন। কনষ্টেবলটি তাহা গ্রহণ করিল বটে, তথাপি দৃঢ় হইয়া রহিল।

সে কহিল, "আপনারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। এই সামান্য গোটা-কয়েক টাকার জন্য আমি আমার দারোগা-সাহেবের অবাধ্য হইতে পারি না।"

অগত্যা আরও সাতটাকা—খরচ করিতে হইল; কিন্তু সতেরোটি টাকা হস্তগত করিয়াও সে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার নড়িবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁ বিস্মিতভাবে তাহার দিকে তাকাইলেন।

রহমৎ খাঁর হাতে ছিল সুভাষচন্দ্রের রিষ্ট্ ওয়াচ্। তাঁহারা উভয়েই লক্ষ্য করিলেন, কনষ্টেবলের সতৃষ্ণ দৃষ্টি তাহাতেই নিবদ্ধ। মুখ ফুটিয়া সে তখন একবার জিজ্ঞাসা করিয়াও ফেলিল, "এই ঘড়ীটা খুব সুন্দর, বেশ দামী বলিয়া মনে হয়; ইহার দাম কত?"

রহমৎ খাঁ কহিলেন, "দাম ?—কত দাম মনে নাই ; তবে—ইহার দাম খুব বেশী নহে।"

—"বটে! তাহা হইলে এই ঘড়ীটা আমায় দিন না? টাকা তো আপনারা আমাকে খুব বেশী কিছু দেন নাই!"

উভয়েই বুঝিলেন, আর উপায় নাই! একবার যখন বাঘের নজর পড়িয়াছে, তখন আর ইহার রক্ষা নাই। কাজেই ঘড়ীটি তাহাকে দিতে হইল।

এই ভাবে সেদিন কিছু মোটা মাল আদায় করিয়া সে চলিয়া গেল। রহমৎ খাঁও পরামর্শ অনুসারে উত্তমচাঁদের দোকানের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলেন।

দোকান পাওয়া গেল বটে, কিন্তু উত্তমচাঁদ ছিলেন না, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না। সেদিন আরও একবার তাঁহার খোঁজ করা হইল—কিন্তু একবারও তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না।

কনস্টেবলটি পরদিন আবার আসিয়া উদয় হইল। রহমৎকে দেখিয়াই সে কহিল, "খাঁ সাহেব, বড়ই বিপদ্ হইয়াছে! আচ্ছা, আপনার সেই ঘড়ীটার দাম কত ছিল বলিতে পারেন ?"

—"তাহা মনে নাই। কেন, কি হইয়াছে ?"

কনস্টেবল কহিল, "না, এমন কিছু নয় ; তবে ঘড়ীটা দেখিতে ছিল বড়ই সুন্দর ; কিন্তু তাহাতেই হইল যত বিপদ্! আমার দারোগা-সাহেব সেটি দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন, তিনি সেটি আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন। যাহোক্,

আমি সেটি ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু দাদা, হাত আমার একেবারে খালি,—একখানা পাঁচ টাকার নোট যদি ধার দেন! তিনি আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, আপনারা এই সরাই হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! যাহোক—পাঁচ টাকার একখানি নোট যদি—"

উপায় নাই। রহমৎ খাঁ নিঃশব্দে তাহাকে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। কনষ্টেবলটি তাহা 'ধার' লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কনষ্টেবল অদৃশ্য হইতেই সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁর পরামর্শ-সভা বসিল। স্থির হইল, মুক্তি পাইতে হইলে আজই অন্যত্র যাইতে হইবে।

উত্তমচাঁদের সঙ্গে তখনও তাঁহাদের দেখাই হয় নাই! রহমৎ খাঁ সেই উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়া গেলেন।

ছয়

সুদূরের যাত্রী

কাবুলে উত্তমচাঁদের গৃহে—রুশদূতের সাহায্য প্রার্থনা—অক্ষ-শক্তির সাহায্য প্রার্থনা—বে-আইনী পন্থায় মস্কো যাইবার সঙ্কল্প—অক্ষশক্তি-কর্তৃক পাসপোর্ট মঞ্জুর—বার্লিণ যাত্রা—২৮শে মার্চ্চ বার্লিণে।

সুভাষচন্দ্র কলিকাতা হইতে বাহির হন, ১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারী—রাত তখন ৮টা। তারপর চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী এক রেলওয়ে-স্টেশন হইতে ট্রেণে চাপিয়া পেশোয়ার পৌঁছান ১৭ই জানুয়ারী রাত ৯টায়। ১৯শে জানুয়ারী তাঁহারা পেশোয়ার হইতে কাবুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং কাবুলে পৌঁছিতে তাহাদের তিনদিন কাটিয়া যায়।

কাবুলে লাহোরী-দরওয়াজার সরাইখানায় ১৩ দিন কোন রকমে বাস করিয়া, একদিন প্রাতঃকালে রহমৎ খাঁ অর্থাৎ ভগৎরাম পুনরায় উত্তমচাঁদের অন্বেষণে তাঁহার দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন ৩রা ফেব্রুয়ারী।—

উত্তমচাঁদ তাঁহার দোকানে বসিয়া আছেন, তাঁহার এক বালক কর্ম্মচারী অমরনাথও সেখানে উপস্থিত, এমন সময় খাকী পেশোয়ারী পোষাকে এক অপরিচিত পাঠান তাঁহার

দোকানে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে পুস্তভাষায় অভ্যর্থনা করিলেন, "আস্‌সালাম আলাইকুম!"

উত্তমচাঁদ বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। তিনি একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন, আপনার কি প্রয়োজন?"

আগন্তুক কোন কথা কহিলেন না, তিনি দু' একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে অমরনাথের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

উত্তমচাঁদ বুঝিলেন, আগন্তুক অমরনাথের সম্মুখে কথা বলিতে চাহেন না। তিনি তখন অমরনাথকে স্থানান্তরে সরাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কহিলেন, "যাও, তুমি দুই কাপ চা লইয়া আইস।"

অমরনাথ চলিয়া গেল—আগন্তুক তখন তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমার নাম ভগৎরাম, মর্দ্দন জেলায় ঘল্লা-ধের গ্রামে আমার বাড়ী। আমারই ভাই পাঞ্জাবের গভর্ণর বাহাদুরকে গুলি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নওজোয়ান ভারত-সভার আমিও একজন কর্ম্মী ছিলাম।"

উত্তমচাঁদ এখন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। যাহোক, তাঁহার কি প্রয়োজন, তিনি তাহা জানিতে চাহিলেন।

ভগৎরাম কহিলেন, "সুভাষবাবুর নাম নিশ্চয়ই জানেন। কয়েক দিন যাবৎ তিনি পলাইয়া কাবুলে আসিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে রাশিয়ায় পাঠাইতে চাই; কিন্তু যে সরাইখানায় আমার সঙ্গে তিনি আছেন, সেখানে এক আফগান

সি. আই. ডি. বড়ই উৎপাত সুরু করিয়াছে। তাই তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। তাঁহার জন্য যদি একটি নিরাপদ আশ্রয়-স্থলের ব্যবস্থা করিয়া দেন!"

স্বর্গ হইতে চাঁদ খসিয়া পড়িলেও বুঝি উত্তমচাঁদ ইহা অপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইতেন না! অন্তর্হিত সুভাষচন্দ্রের সহসা কাবুলে আবির্ভাবের সংবাদে তিনি এতই বিস্মিত হইলেন!

উত্তমচাঁদের সমগ্র অন্তঃকরণ আনন্দে ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি, ভারতের জাতীয় মহাসভার ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি, বাংলার পুরুষসিংহ—সুভাষচন্দ্র বসু আজ বিপন্ন হইয়া তাঁহারই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন! ইহা যে উত্তমচাঁদের পক্ষে কত বড় সৌভাগ্য ও কত বড় গৌরবের কথা, তিনি তাহা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সুতরাং এই সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না—তিনি ভগৎরামের এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন।

তিনি কহিলেন, "বোস্ বাবু আমার এখানে থাকিতে পারিবেন, কিন্তু গুটি কয়েক অসুবিধা আছে। আপনারা উভয়েই আছেন মুসলমানের ছদ্মবেশে। আমি আছি হিন্দু বস্তীতে। এখানে হিন্দুর বাড়ীতে, হিন্দুর বস্তীতে দুজন মুসলমানের বাস করা অনেকটা সন্দেহজনক হইয়া উঠে। কেবল তাহাই নহে, আমি থাকি উপর তলায়; আমার বাড়ীতে নীচের তলায় অন্য একটি ভাড়াটিয়া আছেন। অথচ সেই ভাড়াটিয়ার অজ্ঞাতসারেই আপনাদিগকে বাস করিতে হইবে।

তাহা ছাড়া, আরো একটা অসুবিধা এই যে, আমার স্ত্রী জার্ম্মাণ মহিলা—তিনি পর্দ্দানশীন নহেন। তাঁহাকে না জানাইয়া আপনাদিগকে বাড়ীতে রাখা—সে এক মহা সমস্যা! কাজেই আমি প্রথমে আমার এক মুসলমান বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করিব। মুসলমানের বাড়ীতে মুসলমানের অবস্থান, একেবারেই সন্দেহজনক হইবে না।

আমার সেই মুসলমান বন্ধুটিকে আমরা 'হাজি সাহেব' বলিয়া ডাকি। তিনি সত্তর বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ব্যক্তি; এক জার্ম্মাণ মহিলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন; চীন, জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণী ইত্যাদি বহুদেশ তিনি দেখিয়াছেন—বিষম ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবাপন্ন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তাঁহার খুবই সহানুভূতি আছে। আমি তাঁহাকে একবার বলিয়া দেখিব। যদি সেখানে হয় ভালই,—না হইলে অগত্যা আমার এইখানেই ব্যবস্থা হইবে। যাহোক, আপনি বিকাল বেলায় বোস্ বাবুকে লইয়া আসিবেন।"

ভগৎরাম আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন; তিনি বলিয়া গেলেন, অপরাহ্নে ৪টার সময় তিনি বোস্ বাবুকে লইয়া আসিবেন।

অপরাহ্ন—প্রায় ৪টা, মাত্র দশ মিনিট বাকী আছে, এমন সময় রহমৎ খাঁর ছদ্মবেশে ভগৎরাম পুনরায় উত্তমচাঁদের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উত্তমচাঁদ তাঁহাকে একাকী দেখিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি একা কেন? বোস্ বাবু কোথায়?"

—"ঐ যে তিনি নদীর অপর তীরে দাঁড়াইয়া আছেন।" রহমৎ খাঁ বলিলেন।

উত্তমচাঁদের বাড়ী তাঁহার দোকানের সঙ্গেই। দোকানের সম্মুখ দিয়া কাবুল-নদী প্রবাহিত হইয়াছে। নদীর উপরে একটি সেতু। উত্তমচাঁদ ও রহমৎ সেই সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেতুর অপর প্রান্তে রহমৎ খাঁ যাঁহাকে বোস্ বাবু বলিয়া দেখাইয়া দিলেন, উত্তমচাঁদ তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন! তাঁহার বেশ-ভূষা, চেহারা—সম্পূর্ণই পাঠান। তাঁহাকে দেখিয়া পাঠান না ভাবিয়া অন্য কিছু মনে করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও ছিল না! কে বলিবে ইনিই সুভাষচন্দ্র? তাঁহার সেই অতি-পরিচিত চশমাটি পর্য্যন্ত নাই!

যা হোক্, পরিপূর্ণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, শ্রদ্ধামুগ্ধ অন্তরে উত্তমচাঁদ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন, এবং উপরে একটি কক্ষে সর্ব্বক্ষণ তালাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

হাজি সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই উত্তমচাঁদ জানাইলেন যে, সেখানে সুবিধা হইল না। ভগৎরাম চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই তিনি হাজি সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি এতদিন অনেক বড়-বড় কথা বলিতেন বটে, কিন্তু সুভাষ বাবুকে বাড়ীতে রাখিতে তিনি নানা আপত্তি ও অসুবিধার কথা তুলিয়াছেন। মোট কথা, একজন পলাতক

নেতাকে গৃহে আশ্রয় দিতে তিনি ভয় পাইতেছেন। সুতরাং বোস্ বাবুর স্থান তাঁহার নিজের বাড়ীতেই করিতে হইয়াছে।

উত্তমচাঁদ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বোস্ বাবুর পরিচয় তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকটও গোপন করিয়া যাইবেন; কিন্তু বুদ্ধিমতী মহিলা প্রথম হইতেই সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকট গোপন করিয়া দুটি অপরিচিত পুরুষকে গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রী-সুলভ অভিমানে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহাদের পরিচয় জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সুতরাং স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে অগত্যা উত্তমচাঁদকে প্রকৃত ঘটনা খুলিয়া বলিতে হইল।

সুভাষচন্দ্রের নাম ও দেশপ্রেমের পরিচয় উক্ত মহিলার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি সেই মুহূর্ত্ত হইতে শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয়ে স্বামীর এই মহৎ কাজে তাঁহাকে সাহায্যই করিতে লাগিলেন। সত্য বলিতে কি, উক্ত মহিলার সাহায্য না পাইলে, সুভাষচন্দ্রের গোপনে অবস্থিতি তৎকালে অসম্ভব হইয়া পড়িত!

এই মহাপুরুষকে আত্মগোপনের সম্পূর্ণ সুযোগ দান সম্পর্কে বুদ্ধিমতী মহিলা এত বেশী সতর্ক ছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের কখনও কাশি উঠিলেও পাছে অপর কেহ তাহা শুনিতে পায় এই আশঙ্কায়, তিনি অন্য কোন গোলমালের সৃষ্টি করিয়া অপরকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন!

কাবুলে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে ভগৎরাম প্রথমে রাশিয়ার দূতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করেন। কারণ, সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল, তিনি মস্কো

গমন করিবেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও তাহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। মস্কোএর দূতকে যেন এ বিষয়ে অনেকটা উদাসীন দেখা গেল!

অবশেষে ইটালীয় রাজদূতকেও সমস্ত ব্যাপার জানানো হইল এবং তাঁহাদের দেশে যাইবার জন্য পাসপোর্ট বা অনুমতি প্রার্থনা করা হইল। ইটালীর রাজদূত সীনর ক্যারণী ও তাঁহার পত্নী সীনরা ক্যারণী, এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবেও যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইয়াছেন, এবং রোম হইতে তাঁহার পাসপোর্ট মঞ্জুর করাইবার জন্য যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়।

কিন্তু সুদীর্ঘকাল চেষ্টার ফলেও যখন পাসপোট মঞ্জুর হইয়া আসিল না, তখন সুভাষচন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন; তাঁহার আশ্রয়দাতা উত্তমচাঁদও তখন অন্য পন্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উত্তমচাঁদ সীমান্ত-প্রদেশের অধিবাসী এমন এক ব্যক্তিকে জানিতেন, যে অর্থের জন্য পারিত না এমন কোন অসাধ্য কর্ম্মই ছিল না। অথচ লোকটিকে তিনি বিশ্বাসী বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি ভাবিলেন, ঐ লোকটির সাহায্যে কি বোস্ বাবুকে রাশিয়ায় পাঠানো চলে না?

সে নাকি বহুবার পাসপোর্ট ব্যতীতই রাশিয়ায় গিয়াছে। আফগানিস্থান পার হইয়া কিছুদূর অতিক্রম করিলে 'হ্যাঙ্গো' নামে এক নদী আছে। সেই নদীর অপর তীরেই রাশিয়ার সীমান্ত।

উত্তমচাঁদ তাহার সহিত ধীরে-ধীরে আলাপ করিলেন, অবশেষে কাজের কথা আরম্ভ হইল।

সে লোকটি বলিল যে, পাসপোর্ট ছাড়াও রাশিয়ায় প্রবেশ করা যায়, তাহা একেবারেই কষ্টকর নহে। যাহারা সেই ভাবে প্রবেশ করে, তাহারা নৌকায় বা সেতু পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করে না। তাহারা নদী পার হইবার জন্য ভিস্তিওয়ালার মশক ব্যবহার করিয়া থাকে।

মশকগুলি বায়ুপূর্ণ করিয়া ফুলাইয়া, তাহার উপরে জেলেদের একখানি জাল বিছাইয়া দেওয়া হয়। যাত্রীরা তখন তাহাতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নদী পার হইতে পারে। সুভাষচন্দ্র ও রহমৎ খাঁ কাবুল-নদীও এইভাবে পার হইয়াছিলেন।

আর কোন উপায় না দেখিয়া উত্তমচাঁদ অগত্যা এই পন্থাই স্থির করিয়া রাখিলেন। সুভাষচন্দ্রও তখন রাশিয়ায় যাইবার জন্য এত বেশী আগ্রহান্বিত যে, আইনের পন্থায় কি বে-আইনী পন্থায়, তাহা তিনি বিচার করিতে চাহিলেন না। রাশিয়ায় পৌঁছিয়া যদি রাশিয়ার কারাগারেও তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হয়, তিনি তখন তাহাতেও সম্মত। তথাপি আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিয়া, রাশিয়ায় যাওয়াই তাঁহার একমাত্র কাম্য হইল। সুতরাং ঐভাবে নদীপার হইয়া, বিপজ্জনক পন্থায় যাইতেও তাঁহার আপত্তি হইল না। কেবল ভাবিলেন, তাঁহার সেই 'চালক' লোকটি নির্ভরযোগ্য হইবে কি না!

সেই লোকটির সঙ্গে উত্তমচাঁদ দর-কষাকষি করিলেন, তাহার পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করিলেন, কিছু অগ্রিমও প্রদান করিলেন; কিন্তু তথাপি আরও নানাভাবে

ব্যাপারটিকে চিন্তা করিবার জন্য তখনও কোন দিনস্থির করা হইল না।

এমনই সময়ে একদিন—১৫ই মার্চ্চ, সীনর ক্যারণীর পত্নী আসিয়া সুভাষচন্দ্রকে একখানি পত্র প্রদান করিলেন।

পত্রে ছিল সুভাষচন্দ্রের বহু-আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ: অক্ষশক্তির অন্তর্গত ইটালী ও জার্ম্মাণী—তাঁহার পাসপোর্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৮ই মার্চ্চ প্রাতে ৯টার সময় তিনি অক্ষশক্তির সাহায্যে আফগানিস্থান হইতে যাত্রা করিলেন। একজন ইতালীয় ও দুই জন জার্ম্মাণ—তন্মধ্যে একজন অতি তীক্ষ্ণধী ডাঃ ওয়েলার—তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। পাসপোর্টে সুভাষচন্দ্রের নাম লিখিত হইল 'ক্যারাটাইন্'!

এইভাবে বাংলার, তথা সমগ্র ভারতের সুভাষচন্দ্র, ছদ্মবেশী জিয়াউদ্দিন ও পরবর্ত্তী যাত্রাপথে ক্যারাটাইন্, স্বাধীনতার নেশায় উন্মত্ত হইয়া, স্বদেশ হইতে সুদূরে বিদেশের পথে সাময়িক ভাবে অন্তর্হিত হইলেন।

তাঁহারা প্রথমে একখানি মোটরে চড়িয়া কাবুল হইতে রাশিয়ার সীমান্ত-পথে যাত্রা করেন। রাত্রিটা মধ্যপথে 'পুল খুমড়ী' নামক স্থানে সকলেই বিশ্রাম করিলেন এবং পরদিন, ১৯শে মার্চ্চ, তাঁহারা রাশিয়ায় প্রবেশ করিলেন।

২০শে মার্চ্চ সুভাষচন্দ্র ট্রেণে গমন করিলেন মস্কো। ২৭শে মার্চ্চ তিনি মস্কো উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু মাত্র একটি রাত্রির বেশী তিনি সেখানে কাটাইতে পারিলেন না।

সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া ২৮শে মার্চ্চ তিনি জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিনে উপনীত হইলেন। *

সুভাষচন্দ্র কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার মাত্র কয়েক দিন পরেই পুলিশ-বিভাগ জানিতে পারে যে, দুইজন ভারতীয় (সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম) কাবুলে কোন হিন্দুর গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন। সুতরাং তখন জোর পুলিশের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, উত্তমচাঁদের নিকটও অনুসন্ধান করা হইল।

উত্তমচাঁদকে শুধু প্রশ্ন করিয়াই পুলিশ-বিভাগ ক্ষান্ত রহে নাই! সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয়দান ও তাঁহাকে বিদেশ-গমনে সাহায্য করিবার অপরাধে তিনি দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন এবং পুলিশ তাঁহার লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম-বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ এই মহাপুরুষের সাহায্য না পাইলে, সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় উদ্যম সম্ভবতঃ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত!

সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছিয়া প্রায় মাস-তিনেক পরে হাজি সাহেবের জার্ম্মাণ পত্নীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই মহাপুরুষের নিকট তাঁহার প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া লিখিয়াছিলেন,—

উত্তমচাঁদ নমস্তে! আপনি যাহা করিয়াছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। সারাজীবনেও আমি তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

জিয়াউদ্দিন।

* পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, ইহার মাত্র মাস-কয়েক পরেই—১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল।

সাত

আজাদ্-হিন্দ্ ফৌজ ও আজাদ্-হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট

১৯৪২ সালে প্রাচ্যের পরিস্থিতি—সিঙ্গাপুরের পতন—ভারতীয় সৈন্যদিগকে জাপ-হস্তে সমর্পণ—জাপানের উদ্দেশ্যমূলক উদারতা—মোহন সিংএর নেতৃত্ব—আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ গঠন—জাপ গভর্ণমেণ্টের সহিত সঙ্ঘর্ষ—সুভাষচন্দ্রের আগমন—সভাপতি রাসবিহারীর পদত্যাগ—'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র—আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম-পরিষদ্—নারী বাহিনী—আত্মঘাতী বাল-সেনা—আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা—ইম্ফল-অবরোধ—জাপ-গভর্ণমেণ্টের পতন—আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের বিলোপ—আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচার।

সুভাষচন্দ্র যখন ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া, অবশেষে বার্লিনে পৌঁছিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, প্রাচ্য ভূখণ্ডে এসিয়া মহাদেশে তখন ক্রমশঃ এক বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল। শেষকালে এমন অবস্থা হইল যে, ইংরেজের সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসন এসিয়া মহাদেশে টলটলায়মান হইয়া উঠিল।

১৯৪২ সালের প্রথম ভাগে ব্রিটিশ-শক্তি বিজয়ী জাপানীদের নিকট পরাভূত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া হইতে সরিয়া আসিতেই বাধ্য হইল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটির অন্যতম কেন্দ্র সিঙ্গাপুরের পতন হয়। ব্রিটিশ সৈন্যগণ পূর্ব্বাহ্নেই পলায়ন

করে। তাহাদের পলায়নের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল; কিন্তু ভারতীয় সৈন্যগণকে কিছু না জানাইয়া তাহাদিগকে অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর ফেলিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে সিঙ্গাপুরের সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে।

সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে-সঙ্গেই—১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সন্ধ্যাবেলা সমগ্র ভারতীয় বাহিনীর মধ্য হইতে ব্রিটিশ অফিসারদিগকে পৃথক্ করা হইল এবং ব্রিটিশ কম্যাণ্ডিং অফিসার স্বদেশীয় সৈন্যদিগকে নিরাপদে অন্যত্র পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু হতভাগ্য ভারতীয় অফিসার ও সৈন্যদিগকে ১৭ই তারিখে প্রাতঃকালে ফেরার পার্কের দিকে মার্চ্চ করিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

লেঃ কর্ণেল হাণ্ট সেখানে হতভাগ্য ভারতীয় সৈন্যদিগকে জাপ-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মেজর ফুজিয়ারার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে চূড়ান্তভাবে বলিয়া দিলেন, "তোমরা এতদিন আমাদিগকে যেভাবে মানিয়াছ, এখন হইতে জাপ-কর্ত্তৃপক্ষকে সেরূপ মান্য করিয়া চলিও।"

তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা-প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন সাইগল বিচার-কালে তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন, "ব্রিটিশের পক্ষ হইতে লেঃ কর্ণেল হাণ্ট ভারতীয় অফিসার ও সৈন্যদিগকে একদল ভেড়ার মতই জাপদের হাতে সঁপিয়া দিলেন!"

মেজর ফুজিয়ারা অসহায় যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মানসিক অবস্থা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

তিনি তাহাদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বাহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "জাপান পূর্ব্ব-এসিয়ার সমস্ত জাতিকে স্বাধীন ও মুক্ত দেখিবার অভিলাষী ; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি কখনও ভাল হইতে পারে না। সুতরাং ভারতের উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাপ-সরকার সকল রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। কাজেই আমি আপনাদিগকে যুদ্ধবন্দীরূপে দেখিতে চাহি না। আমাদের পক্ষ হইতে বলিতে পারি, আপনারা স্বাধীন। আমি ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছি।"

ক্যাপ্টেন মোহন সিং তখন তাঁহার সেনা-বাহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বর্ত্তমানে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য ভারতীয়দের যুদ্ধ করিবার সুযোগ আসিয়াছে।"

মেজর ফুজিয়ারার উদ্দেশ্য ছিল, জাপানের তাঁবেদার হিসাবে একটি ভারতীয় সমিতি খাড়া করিতে হইবে ; কিন্তু ভারতীয়গণ মেজর ফুজিয়ারাকে কোনরূপে এড়াইবার জন্য বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহারা আরও গভীর ভাবে চিন্তা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে মেজর ফুজিয়ারার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ইহার পর ৯ই এবং ১০ই মার্চ্চ, ১৯৪২ সালে মালয়ের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুরে একটি সভা করেন। সিঙ্গাপুরের সভায় স্থির হয় যে, টোকিওতে একটি শুভেচ্ছা দল-পাঠান হইবে।

ইহার পর রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিওতে একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে উল্লিখিত শুভেচ্ছা-দলের প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও হংকং, সাংহাই ও জাপান-প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পূর্ব্ব-এসিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়; এই স্বাধীনতা হইবে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার বৈদেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান এবং ক্রিয়া-কলাপের অধিকারী হইতে পারিবে একমাত্র ভারতীয়গণের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় স্বার্থে চালিত 'স্বাধীন ভারত-বাহিনী' বা 'আজাদ-হিন্দ ফৌজ'; সকল ক্ষমতা আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ পরিচালিত করিবে; আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের একটি কর্ম্ম-পরিষদ্ থাকিবে; এই কর্ম্ম-পরিষদ্ সামরিক প্রয়োজনে জাপানের নিকট হইতে নৌবল, বিমানবল প্রভৃতি চাহিতে পারেন, ইত্যাদি।

এই সম্মেলন আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব করেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র রচনা করিবার অধিকার ভারত-ভূমিতে স্বয়ং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপরই বর্ত্তিবে; ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই এই অধিকারের মালিক।

১৯৪২ সালের ১৫ই হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ককে একটি প্রতিনিধি-সম্মেলন বসে। জাপান, মাঞ্চুকুও, হংকং, বোর্ণিও, জাভা, মালয় ও শ্যাম হইতে ১০০ জন প্রতিনিধি

সমবেত হন। ভারতীয় বাহিনী হইতেও প্রতিনিধি আসেন। ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবন্দী ছিলেন। এই সম্মেলনে আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের মূলনীতি নির্দ্ধারিত হয়—

(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব্ব-এসিয়ার প্রবাসী ভারতীয়গণকে লইয়া একটি আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে।

(২) আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের আদর্শ, কার্য্যক্রম ও সকল প্রকার পরিকল্পনা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, কার্য্যক্রম ও উহার পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসৃত হইবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে; কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত যোগ-সূত্র সাধন করিতে হইবে।

(৩) পূর্ব্ব এসিয়ার ভারতীয় বাহিনী হইতে এবং ভারতীয় বেসামরিক জনসাধারণের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একটি আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করিতে হইবে।

(৪) ভারতবর্ষের প্রতি এবং নবগঠিত আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের প্রতি জাপানীদের নীতি কি, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য জাপানী কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতে হইবে।

এইরূপে ব্যাঙ্কক-সম্মেলন হইতে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ গঠিত হইল। ইহার সভাপতি হইলেন শ্রীরাসবিহারী বসু। সিঙ্গাপুরে উক্ত সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্মস্থল হইল এবং পূর্ব্ব-এসিয়ার প্রত্যেক দেশে ইহার শাখা-সঙ্ঘ স্থাপিত হইল। এই সময় গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯৪২ সালে ৮ই আগষ্ট 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ দুইটি মন্ত্রে দীক্ষিত হইল—"করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে।"

ভারতব্যাপী দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, ভারতবর্ষের সমস্ত কংগ্রেস-নেতাকে তড়িৎ আক্রমণ হানিয়া ব্রিটিশ শক্তি কারারুদ্ধ করিল ; সহস্র-সহস্র কংগ্রেসকর্ম্মী ও জনগণ ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন ; ব্রিটিশ বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া গ্রাম, নগর ধ্বংস করিতে লাগিল।

এই সকল সংবাদে পূর্ব্ব-এসিয়ার সর্ব্বত্র অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য এবং অদম্য কর্ম্মোৎসাহ চূড়ান্ত সীমায় ঠেলিয়া উঠিল। এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে এইবার সর্ব্বপ্রথম ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর অধিনায়কত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজের গঠন-কার্য্য আরম্ভ হইল। মালয়ে যে সকল ভারতীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাদের লইয়াই বাহিনী গঠনের প্রাথমিক কর্ম্মসূচী অনুসৃত হইতে লাগিল ; মালয়-প্রবাসী ভারতীয়গণের নিকট আবেদন জানাইলে আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল।

ভারতীয়গণের এই স্বাধীন প্রচেষ্টা জাপান কিছুতেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। ইহাতে বরং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মনেও আতঙ্ক এবং ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। সুতরাং জাপানী কর্তৃপক্ষের সহিত আজাদ-হিন্দ ফৌজের কর্ম্ম-পরিষদের সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। প্রধানতঃ দুইটি কারণে তিক্ততা চরম হইয়া পড়িল—

(১) কর্ম্ম-পরিষদ্ দাবী জানাইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব-এসিয়া এবং আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের প্রতি জাপানের নীতি কি, ইহা জাপান অবিলম্বে ঘোষণা করুক।

জাপান উত্তরে কতকগুলি মামুলী জবাব জানাইয়াছিল; কিন্তু কর্ম্ম-পরিষদ্ জাপানী গভর্ণমেণ্টের ঐ মামুলী জবাব সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করিতে পারেন নাই।

(২) সম্পূর্ণভাবে জাপানীগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত 'ইয়াকুরো-কিকান' নামক 'লায়াসন' ডিপার্টমেণ্টের অফিসারগণ আজাদ-হিন্দ ফৌজের কার্য্য-কলাপে হস্তক্ষেপ করিতে আসিতেন, সুতরাং ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসেই চরম সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিল। মালয়ে গঠিত আজাদ-হিন্দ ফৌজকে জাপানী সমর-কর্ত্তাদের আদেশ অনুসারে বার্ম্মায় স্থানান্তরিত করিতে কর্ম্ম-পরিষদ্ অস্বীকার করিল; জাপানীদের অন্যান্য অনেক দাবীও সরাসরি অগ্রাহ্য করা হইল।

কর্ম্ম-পরিষদ্‌কে না জানাইয়া জাপানীরা ৮ই ডিসেম্বর আজাদ-হিন্দ ফৌজের কর্ণেল এন্. এস্. গিল্‌কে গ্রেপ্তার করিলে অবস্থা চরমে গিয়া পৌঁছে।

এই সম্পর্কে জেনারেল মোহন সিং নিজে বলিয়াছেন: একদিন রাত্রে কয়েকজন জাপ সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট আসেন এবং কর্ণেল নিরঞ্জন সিংহ গিলকে গ্রেপ্তার করিতে চাহেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে তাহাদের নিকট সমর্পণ করিতে অসম্মত হন। তিনি বলেন, তাঁহার কোন অফিসার কোন অপরাধ করিলে তিনি সামরিক আদালতে তাঁহার বিচার করিবেন, কিন্তু তাঁহাকে তাহাদের নিকট সমর্পণ করিবেন না। ইহাতে জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বিরক্ত হন

এবং পরে কর্ণেল গিল ও জেনারেল মোহন সিং উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়। *

জেনারেল মোহন সিং বলেন, ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসেই জাপানের বিজয়-সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। আর তখন ভারতকে এ কার্য্যে নিয়োজিত করাই তাহাদের অভিপ্রায় ছিল।

জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে 'ভারতীয় জাতীয় সেনাদল' নামে আপত্তি করেন এবং 'ভারতীয় স্বাধীনতা সেনাবাহিনী' নামকরণ প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহারা 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' নাম করিতে চাহেন। কারণ, তাঁহারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই প্রতিনিধি। প্রভেদ এই যে, আজাদ-হিন্দ ফৌজ স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ব্যবহার সমর্থন করেন, আর কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রামই চালাইতেছে।

উপসংহারে জেনারেল মোহন সিং বলেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্যই আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল। §

কর্ণেল গিল ও মোহন সিংএর এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পরিষদের সভ্যগণ পদত্যাগ করেন। ইহাতে শ্রীরাসবিহারী অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন এবং জানান, তিনি অবিলম্বে জাপান যাইবেন এবং প্রধান-প্রধান বিষয়ে জাপানীদের স্পষ্ট নীতি কি, তাহা বাহির করিবেন। ইতোমধ্যে সঙ্ঘের কার্য্য চলিতে থাকিবে।

* ব্রিটিশের নিকট তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা বন্দী ছিলেন।

§ আনন্দবাজারের সংবাদদাতা—লাহোর, ১১ই মে, ১৯৪৬ সাল।

এই সময় মালয়-শাখাও প্রস্তাব করেন যে, শ্রীরাসবিহারী বসুকে এতদ্দ্বারা অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি প্রধান-প্রধান বিষয়ে টোকিও-গভর্ণমেণ্টের মতামত ও নীতি কি, তাহা জানিতে সম্ভাব্য চেষ্টা করুন, এবং টোকিও-গভর্ণমেণ্টও ঘোষণা, বিবৃতি বা অন্য যে-কোন উপায়ে তাহা যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করুক। ইতিমধ্যে সঙ্ঘের কাজ পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকিবে, কিন্তু টোকিও-গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা বা বিবৃতির পরই নূতনভাবে অগ্রসর হওয়া যাইবে।

এই যখন অবস্থা, তখন ইয়াকুরো-কিকান আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘকে হীনবল করিবার জন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল গঠন করিল। উহার অফিসারগণ আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের বিরুদ্ধে গুপ্ত যুব-আন্দোলন গঠন করিতে লাগিলেন এবং নিজেরাও তাঁবেদার অনুচর লইয়া আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ব্যাপক-ভাবে প্রচারকার্য্য এবং মিথ্যা রটনা সুরু করিলেন।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মালয়-শাখা-কমিটি তিন দিন মিটিং ও আলোচনার পর শ্রীরাসবিহারীর নিকট একটি স্মারক-লিপি পাঠাইতে মনস্থ করেন; এই স্মারক-লিপি যথাস্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জাপানীরা গোপনে তাহা হস্তগত করিয়া লয়। তাহারা মালয়-শাখার সভাপতি শ্রী এন্. রাঘবন্‌কে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করার জন্য শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর উপর চাপ দিতে লাগিল। ফলে শ্রীরাঘবন্ পদত্যাগ করেন।

উক্ত শাখার অন্যান্য সভ্যগণ বুঝিলেন যে, পদত্যাগই

জাপানীদের কাম্য; কেননা, তাহা হইলে জাপানের তাঁবেদারগণকে লইয়া সঙ্ঘ পুনর্গঠিত করা যাইবে, আর ইহাতে আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ সম্পূর্ণভাবে জাপানীদের 'পুত্তলিকা' হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া আর কোন সভ্যই পদত্যাগ করিলেন না।

এরূপ শোনা যায় যে, শ্রীরাসবিহারী বসুর কার্য্যকলাপ এবং নেতৃত্বে যোগ্যতার অভাব ঘটিয়াছে, এরূপ ধারণা ভারতীয়গণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। উৎসাহের অভাবও পরিলক্ষিত হইতেছিল। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে আর একটি প্রতিনিধি-সম্মেলন হয়। ইহাতে পূর্ব্ব-এসিয়ার সমস্ত দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এখানে কার্য্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয়। এই সভায় শ্রীরাসবিহারী বসু জানান যে, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু আসিতেছেন এবং আন্দোলনের গুরু দায়িত্ব-ভার তাঁহার ন্যায় একজন যোগ্যতম জননেতার উপর অর্পিত হইলে তিনি পদত্যাগ করিতে সম্মত আছেন।

১৯৪৩ সালের ২০শে জুন শ্রীযুক্ত হাসান নামক এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিণ যোগে জাপানে উপস্থিত হন। ২রা জুলাই তারিখে তিনি সিঙ্গাপুরে পৌঁছেন এবং ৪ঠা জুলাই আহূত এক প্রতিনিধি-সম্মেলনে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের 'নেতাজী' অর্থাৎ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং সকল আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীরাসবিহারী পদত্যাগ করেন।

বাংলার তথা ভারতের একজন জনপ্রিয় কংগ্রেস-নেতাকে লাভ করিয়া আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ এবং তদীয় বাহিনী নবপ্রাণ-সঞ্চারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ ফৌজের কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হয় এবং ঐ তারিখে উক্ত বাহিনীর গঠন-সংবাদ প্রকাশ্যভাবে জগতে ঘোষণা করা হইল। উক্ত বিরাট জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া সুভাষচন্দ্র সেদিন বলিয়াছিলেন,—

"ভারতের স্বাধীনতার সেনাদল! আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্ব্বের দিন। আজ ঈশ্বর আমাকে এই কথা ঘোষণা করার অপূর্ব্ব সুযোগ এবং সম্মান দিয়েছেন যে, ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সেনাদল গঠিত হয়েছে।

হে আমার সতীর্থগণ, সেনাদল! তোমাদের রণধ্বনি হোক্ —'দিল্লী চলো, দিল্লী চলো!' প্রাচীন দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়োৎসব সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। মনে রেখো যে তোমাদের মধ্য থেকেই স্বাধীন-ভারতের ভাবী সেনানায়ক-দল গড়ে উঠবে।

আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বেশী গর্ব্বের দিন— একথা আমি বলেছি। পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান এবং গৌরবের বিষয় অন্য কিছুই নাই। কিন্তু এই সম্মানের সঙ্গে সমপরিমাণ দায়িত্বও রয়েছে এবং সে দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি—আলোকে এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ে আমি

সর্ব্বদা তোমাদের পাশে-পাশে থাকব ; বর্ত্তমানে তোমাদের আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-কষ্ট, দুর্গম অভিযান এবং মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু দিতে অসমর্থ।"

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণের পর হইতে ঘটনাবলী দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। নারীগণও দলে-দলে আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের সভ্য হইতে থাকে। তাহাদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছা-সেবিকা বাছাই করিয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীর নেতৃত্বে 'রাণী অফ্ ঝান্সী রেজিমেণ্ট' গঠিত হইল। অনেক মহিলা রেড্-ক্রসের সভ্য হইলেন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে এবং পরে রেঙ্গুণেও নারীদিগকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য দুইটি সামরিক শিক্ষা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

সুভাষচন্দ্র ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৩ সালের ২২শে অক্টোবর। ২২শে অক্টোবর ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। কারণ ১৮৫৭ সালে, প্রথম যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সিপাহী-যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অধিনায়িকা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইএর জন্ম-তারিখ ছিল ২২শে অক্টোবর। সুভাষচন্দ্র সেই জন্য ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর প্রতিষ্ঠা-দিবসও ২২শে অক্টোবর বাছিয়া লইয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র সেদিন বলিয়াছিলেন, "ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। পূর্ব্ব-এসিয়ায় আমাদের আন্দোলনের অগ্রগতির পথে ইহা একটি স্মরণীয় কাহিনী। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে,

উপরে (বাঁয়ে) : মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ খান। (ডাইনে) : ক্যাপ্টেন ডাঃ লক্ষ্মী স্বামিনাথন্। **মাঝখানে :** সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দের অফিসারগণ সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন। **নীচে** (বাঁয়ে) : ক্যাপ্টেন গুরুবক্স ধীলন। (ডাইনে) : ক্যাপ্টেন প্রেমকুমার সাইগল।

আমাদের আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আমরা আমাদের দেশের পুনর্জীবনের মহান্ কাজে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমরা ভারতের জন্য এক নবযুগ আনয়ন করিতেছি। কাজেই আমাদের নূতন জীবনের ভিত্তি হইবে সুদৃঢ়। স্মরণ রাখুন যে, ইহা ঢক্কা-নিনাদ নয়, আমরা ভারতের পুনর্জীবন আসন্ন দেখিতেছি। এই নবজাগরণ ভারতের নারীদের মধ্যেও স্বাভাবিক।

আজ যে শিক্ষা-শিবিরের উদ্বোধন করা হইতেছে, তাহাতে আমাদের ১৫৬ জন ভগ্নী শিক্ষালাভ করিতেছেন। আমি আশা করি, শোনানে (অর্থাৎ সিঙ্গাপুরে) তাহাদের সংখ্যা শীঘ্রই এক হাজার হইবে। থাইল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মদেশেও নারী-শিক্ষা-শিবির স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শোনানে হইতেছে কেন্দ্রীয় শিবির। আমার বিশ্বাস, এই কেন্দ্রীয় শিবিরে এক হাজার 'ঝান্সীর রাণী' প্রস্তুত হইবে।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কেবল নারী-বাহিনী গঠন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সমগ্র দেশে তখন স্বাধীনতার জন্য এরূপ বিপুল চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল যে, বালক-বালিকাদের সমন্বয়ে একটি বাল-সেনাদলও গঠিত হইয়া উঠিল। ইহারা আত্মঘাতী সেনাদল হিসাবে কার্য্য করিত।

ব্রহ্ম-রণাঙ্গনে এই কিশোর-কিশোরীগণ যে অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছে, তাহা স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

এই বাল-সেনাদলের প্রধান কাজ ছিল শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা। তাহারা নিজেদের পিঠে মাইন বাঁধিয়া সহসা শত্রুর

ট্যাঙ্কের তলায় শুইয়া পড়িত। ট্যাঙ্কগুলি ধ্বংস হইত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের দেহও চূর্ণ-বিচূর্ণ ও পিষ্ট হইয়া যাইত, এবং তাহাদের নিষ্পাপ সাহসী আত্মা অমর-ধামে চলিয়া যাইত।

১৯৪২ সালে আজাদ-হিন্দ ফৌজে স্বেচ্ছা-সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছিল। অগণিত লোক সৈন্যদলে নাম লিখিয়াছিল, কিন্তু জাপানীদের অস্পষ্ট নীতির ফলে সৈন্যদের শিক্ষাদান-কার্য্যে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় নাই। এইবার সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই মতামত ব্যক্ত করিলেন যে,—

এই আজাদ-হিন্দ ফৌজই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় বাহিনী। জাপানীদের সহিত ইহার কোনরূপ সংশ্রব থাকিলে ইহা বিভীষণ-বাহিনী বলিয়া কুখ্যাত হইবে। ইহার নীতি, কার্য্যকলাপ ও নেতৃত্ব ভারতীয় দেশ-প্রেমিকগণ-কর্ত্তৃকই চালিত হইবে; কোনরূপ বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব, অথবা একজনও বৈদেশিক সৈন্যকে ভারতভূমিতে স্বীকার করা চলিবে না। জাপানীদের ভারত আক্রমণের অধিকার নাই। জাপানীগণ যদি বলেন যে, তাঁহারা ভারতকে ব্রিটিশ-শক্তির কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দান করিতে যাইতেছেন, তথাপি আজাদ-হিন্দ ফৌজ তাহাদিগকে অন্যায় আক্রমণকারী হিসাবেই গণ্য করিবে। ভারতবর্ষকে যদি ব্রিটিশের কবল হইতে মুক্ত করিতে হয়, তবে একমাত্র ভারতের নিজস্ব বাহিনীই তাহা করিতে পারে। জাপানী-দের সামরিক কৌশল ও নীতির দ্বারা এই ভারতীয় বাহিনী কথনই চালিত হইতে পারিবে না; জাপানীদের নীতির সহিত ইহার কোনরূপ সংশ্রব থাকিলে ইহা 'পঞ্চম বাহিনী' বলিয়া ইতিহাসে কলঙ্কভাগী হইবে।

এই নীতিগত সুস্পষ্ট ঘোষণার ফলে আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজ নবশক্তিতে উজ্জীবিত হইল। দেশপ্রেমিক ভারতীয়গণ এই প্রতিষ্ঠান এবং এই বাহিনীকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া ইহাকে আরও শক্তিশালী করিবার জন্য সকল শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করিলেন। মালয়ে একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইল। ইহাতে পালাক্রমে একই সময়ে ৭০০০ জনকে করিয়া সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৭০০০ ব্যক্তি লইয়া একটি দল গঠিত হইত। এইরূপে দলে-দলে স্বেচ্ছা-সৈন্য শিক্ষিত হইতে লাগিল। ভারতীয় বাহিনী ও নন্-কমিশন অফিসারগণের মধ্য হইতে উর্দ্ধতন অফিসার বাছাই করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় আজাদ-হিন্দ ফৌজ সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে এক বিরাট চাঞ্চল্যের ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। ভারতীয়গণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অকাতরে অর্থদান করিতে লাগিলেন। অর্থভাণ্ডার, সৈন্যবাহিনী, নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্য-কলাপ প্রভৃতি ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ করায় একটি গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল।

সুতরাং সুভাষচন্দ্র একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলেন। ইহার নাম হইল 'স্বাধীন-ভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট'। তাঁহাকেই রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান অধিনায়ক করা হইল। ইহা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুধ্যমান সকল রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল। ঐ বৎসর ২৫শে অক্টোবর স্বাধীন-ভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট

যথাযথ নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল।

আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ ও স্বাধীন-ভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মস্থল ভারতের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় ১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারী উহার কর্ম্মস্থল বার্ম্মায় স্থানান্তরিত হয়। বার্ম্মায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর হইতে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কার্য্য-কলাপ আরও ব্যাপক হইয়া উঠিল।

স্বাধীন-ভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট যথাযথ ভাবে মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াই বিভিন্ন রাষ্ট্রিক কার্য্য চালাইতেন, কাহারও খুসীমত বা নীতিশূন্য ভাবে কিছুই ঘটিতে পারিত না। এই সকল মন্ত্রী ছিলেন আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। রেঙ্গুণই ছিল অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের রাজধানী এবং প্রধান কর্ম্মস্থল। এখানে ১৯টি বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট ছিল। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টেরই রীতিমতভাবে রেকর্ড-বুক্‌স্, নথিপত্র, হিসাব প্রভৃতি বিষয়ের সংরক্ষিত ব্যবস্থা ছিল। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই এই সকল কার্য্যে নিয়োগ করা হইত। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট তাঁহাদের জবাবদিহি করিতে হইত।

এই সঙ্ঘের রিয়ার হেড্-কোয়াটার্স ছিল সিঙ্গাপুরে; এখান হইতেই মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলের তদারক করা হইত। আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের শাখা কেবল মালয়েই ছিল ৭০টি; মালয়-শাখার সভ্য-সংখ্যা দুই লক্ষেরও উপর; বার্ম্মায় ছিল ১০০টি শাখা, শ্যামে ছিল ২৪টি। ইহা

ছাড়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ, চীন, মাঞ্চুকুয়ো এবং জাপান প্রভৃতি স্থানেও ইহার অসংখ্য শাখা এবং অভাবনীয় প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের জন্য সৈন্য এবং সিভিল সার্ভিসের জন্য অফিসার সংগ্রহ করা হইত; কিন্তু ইহাতে কোনপ্রকার জোর-জুলুম ছিল না।

আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম সদস্য, লেঃ কর্ণেল এ. সি. চাটার্জ্জি মুক্তিলাভান্তে কলিকাতায় আসিয়া দেশপ্রিয়-পার্কে সমবেত জনতার সম্মুখে বলিয়াছেন,—

"প্রত্যেক অফিসার, সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক স্ব-ইচ্ছায়, নিজের স্বাধীন সম্মতিতে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। এই সংগঠনে কোন প্রাদেশিকতা বা সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মতার পর্য্যন্ত একটুক ছিল না। এই সংগঠনে ব্যক্তিগত উন্নতির মানদণ্ড ছিল, শুধু তাহার কর্ম্মদক্ষতা ও যোগ্যতা —সে যে-কোন প্রদেশেরই হউক বা যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন!

সিঙ্গাপুরে যখন একবার টাকা তুলিবার কথা হয়, তখন সেখানকার চেটিয়ার সম্প্রদায় নেতাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন—তাহারা টাকা দিতে রাজী আছেন, কিন্তু তাহাদের মন্দিরে গিয়া সেজন্য নেতাজীকে বলিতে হইবে।

তখন নেতাজী বলিলেন—যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, মানুষ ভগবানকে ডাকিতে পারে; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ব্যাপারে, দেশের ব্যাপারে ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। তিনি মন্দিরে যাইতে রাজী আছেন, যদি তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ-নির্ব্বিশেষে সকলকে তাঁহাদের মন্দিরে যাইতে অনুমতি দেন।

তাহা যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের টীক চাহেন না।

তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন—যাহাকে খুসী তাহাকে লইয়া নেতাজী তাঁহাদের মন্দিরে যাইতে পারেন—তাঁহারা কোন রকম আপত্তি করিবেন না।

সেদিন নেতাজীর সঙ্গে মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, শিখ সব জাতীয় অফিসার ও সৈনিক—চেট্টিয়ার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল। সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে ইহা তিনি প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাহার আগে সে মন্দিরে হিন্দু ছাড়া কেহ ঢুকে নাই এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ মন্দিরের ভিতর যাইতে পারে নাই। শুধু তাহাই নহে—মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ আসিয়া সকলের কপালে বিভূতি আঁকিয়া দিয়াছিল মায় মুসলমান ও খৃষ্টান অফিসার পর্য্যন্ত।"

সামরিক শিক্ষাদানের জন্য নয়টি কেন্দ্র ছিল, সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুণে অফিসার-ট্রেণিংএর জন্য দুইটি কেন্দ্র ছিল; কোন কেন্দ্রেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন রকমের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয় নাই. শিক্ষার্থিগণই পালাক্রমে সে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; অফিসার ও এন্. সি. ও. গণ হিন্দুস্থানী ভাষায় শিক্ষাদান করিতেন। যুদ্ধে আদেশ-দানের রীতিও ছিল হিন্দুস্থানীতে। এক মাত্র মালয়েই ২০ হাজার বে-সামরিক ব্যক্তিগণকে শিক্ষাদান করিয়া আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হাজারে-হাজারে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছিল, ইহাদের অনেককেই আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের সমগ্র আন্দোলনে একমাত্র

ভারতীয়গণের অর্থই ব্যয় করা হইত। বার্ম্মায় ভারতীয়গণের নিকট হইতে কিছুদিনের মধ্যে ৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে নব-বৎসরের উপহার হিসাবে ভারতকে মালয় ৪০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিল। আজাদ-হিন্দ ফৌজ নিজ প্রয়োজনের জন্য যাবতীয় অস্ত্রপাতি গোলাবারুদ নিজ অর্থ দিয়াই ক্রয় করিত।

আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ ছিল একটি রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইহাকে সমাজ-সেবার গুরু দায়িত্বভারও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ-পীড়িতদের সাহায্যকল্পে ইহার ভাণ্ডার হইতে অজস্র অর্থ ব্যয় করা হইত। মালয়ের শ্রমিকগণ এক সময় চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়াছিল; উক্ত সঙ্ঘ তখন মজুরদিগের জন্য চিকিৎসালয়, ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য, খাদ্য প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছে

কুয়ালালামপুরে ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সাহায্য-কেন্দ্র। এখানে প্রত্যহ এক হাজারের উপর, নারী, শিশু ও দুর্গত-জনকে নানাবিধ সাহায্য দেওয়া হইত। ইহার মাসিক খরচ ছিল ৭৫ হাজার ডলার।

এই সঙ্ঘ বার্ম্মাতে অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইত, শ্যামেও একটি আধুনিক ধরণের উচ্চাঙ্গের হাসপাতাল খুলিয়াছিল; তা ছাড়া, দুর্গত ভারতীয়গণের বসতি স্থাপনের জন্য উক্ত সঙ্ঘ ভূমি-সংগঠনের কার্য্যও গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া মালয়ের জঙ্গল অপসারিত করিয়া প্রায় ২০০০ হাজার একর জমি বাসোপযোগী করা হইয়াছে।

ভারতীয়গণ এখানে ভূমি-কর্ষণের ও বাণিজ্যোপযোগী বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করিয়াছিল। বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের জন্যও আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ সচেষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্ব-এসিয়াবাসী ভারতীয়গণের জন্য হিন্দুস্থানী শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। উক্ত সঙ্ঘ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কেবল বার্ম্মাতেই উক্ত সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৬৫টি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্বাধীন-ভারতের এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট, আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের পিছনে শুধু যে পূর্ব্ব-এসিয়ার ভারতীয়গণেরই সামগ্রিক সমর্থন ছিল তাহা নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের, এমন কি তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যেও সমর্থনের অভাব ছিল না।

আজাদ-হিন্দ বা স্বাধীন-ভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ

(১) শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধমন্ত্রী

(২) ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী—নারী-সংগঠন

(৩) মিঃ এস. এ. আয়েঙ্গার—প্রচার

(৪) লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জ্জি—অর্থ

(৫) " এস্. এস্ ভগৎ

(৬) " জে. কে. ভোঁসলে

(৭) লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল গুলজারা সিং
(৮) " এম্‌. জেড্‌. কিয়ানি
(৯) " এ. ডি. লোকনাথন
(১০) " ঈশান কাদির
(১১) " আজিজ আমেদ
(১২) " শা নওয়াজ—সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি
(১৩) মিঃ এ এম্‌. সহায়—সম্পাদক (মন্ত্রীর পদমর্য্যাদাসম্পন্ন)
(১৪) শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু—(সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা)
(১৫) মঃ করিম গণি
(১৬) শ্রীদেবনাথ দাস
(১৭) মঃ ডি. এম্‌. খান্‌
(১৮) মিঃ এ. ইয়েলাপ্পা
(১৯) মিঃ আই. থিবি
(২০) সর্দ্দার ঈশ্বর সিং
(১৫–২০)—পরামর্শদাতাগণ
(২১) মিঃ এ. এন্‌. সরকার—আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈনিকগণ কুচ-কাওয়াজের সময় যে সামরিক সঙ্গীত করিত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কদম্‌ কদম্‌ বাড়ায়ে জা
খুসীতে গীত গায়ে জা
এ জিন্দ্‌গী হ্যায় কৌম্‌ কী
(তো) কৌম্‌ পৈ লুটায়ে জা॥

তুঁ শেরে হিন্দ আগে বাঢ়
মরণেসে ফিরভি তু ন ডর
আসমান তক্ উঠাকে শির
জোশে বতন্ বঢ়ায়ে জা॥

তেরী হিম্মত বাঢ়তি রহে
খুদা তেরে শুনতা রহে
জো সামনে তেরে চঢ়ে
তো খাক্‌মে মিলায়ে জা॥

চলো দিল্লী পুকারকে
কৌমী নিশান্ সামালকে
লাল কিল্লে পৈ গাড়কে
লহ্‌রায়ে জা লহ্‌রায়ে জা॥

আজাদ-হিন্দ ফৌজের ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে বার্ম্মার পরিস্থিতি খুব আশাপ্রদ ছিল না। সুভাষচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব এই যে, তাঁহারই অনমনীয় নীতির ফলে জাপানীরা ভারত-আক্রমণের নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

হুকোয়াং উপত্যকায় ব্রিটিশের আক্রমণ এবং তাহাদের চিন্দুইন নদী অতিক্রমের সম্ভাবনায় জাপানীরা অধীর হইয়া পড়িল। তাহারা তাড়াহুড়া করিয়া একটা পরিকল্পনা করিয়া ফেলিল। ইম্ফল দখল করিবার জন্য অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আজাদ-হিন্দ ফৌজ জাপানীদের ভারত-আক্রমণের অধিকার কিছুতেই স্বীকার করিবে না। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে জাপানীদের নীতি ঘোষণা করিতে হইল যে, উহারা কেবল ইম্ফলই দখল করিতে চায়; অতঃপর ভারত-

আক্রমণের সমস্ত সামরিক কার্য্য-কলাপ আজাদ-হিন্দ ফৌজের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

আজাদ-হিন্দ ফৌজ পরিস্থিতি সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন, তথাপি ইম্ফল দখলের যুদ্ধে তাঁহারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী আজাদ-হিন্দ ফৌজ আক্রমণাত্মক কার্য্য সুরু করে, এবং ১৮ই মার্চ্চ তাঁহাদের বাহিনী ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতভূমিতে পদার্পণ করে।

এই বাহিনীতে প্রধানতঃ তিনটি ব্রিগেড ছিল:—(১) জেনেল শা' নওয়াজের নেতৃত্বে ৬২০০ সৈন্য লইয়া গঠিত 'সুভাষ-ব্রিগেড'।

(২) কর্ণেল ইনায়েৎ কয়ানির নেতৃত্বে 'গান্ধী ব্রিগেড'; ইহার সৈন্য-সংখ্যা ২৮০০ জন।

(৩) কর্ণেল মোহন সিংএর নেতৃত্বে 'আজাদ ব্রিগেড', ইহাতে দুই নম্বর ব্রিগেডের সমান-সংখ্যক সৈন্য ছিল।

ইহা ছাড়া, তিন শত বাহাদুর-দলের ফৌজ ছিল; সাত শত বেসামরিক সাহায্যকারীও ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলনের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য লইয়া গঠিত 'নেহেরু ব্রিগেড'—ইহাদের পিছনে ছিল।

তাঁহারা মোরাই, কোহিমা ও অন্যান্য স্থান দখল করিয়া ইম্ফলে উপস্থিত হন এবং ইম্ফল অবরোধ করেন। কিন্তু এই সময় ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হইল এবং ইম্ফল আক্রমণ ও অধিকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

প্রকৃতির এই দুর্য্যোগময়ী অবস্থায় আক্রমণ পরিহার করা হইল এবং আক্রমণ পরিহারের পর সংযোগসূত্র রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িল ; সুতরাং আজাদ-হিন্দ ফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

অনন্তর আজাদ-হিন্দ ফৌজ কেবল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। ব্রিটিশ শক্তি যখন বার্ম্মা আক্রমণ করিল, তখন এই বাহিনীর অনেক 'স্টাফ অফিসার' ব্রিটিশ পক্ষে যোগ দেন। ব্রিটিশের হস্তে মিণ্ডিলার পতন হইলে যখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে, জাপানীরা ব্রিটিশ অগ্রসরকে আর বেশীদিন ঠেকাইতে পারিবে না, তখন রেঙ্গুণ পরিত্যাগের পরিকল্পনা করা হইল।

১৯৪৫ সালে ২৩শে এপ্রিল জাপানী প্রধান সেনাপতি ও বার্ম্মা-গভর্ণমেণ্ট রেঙ্গুণ ত্যাগ করিল। তাহাদের সহিত একত্রে রেঙ্গুণ ত্যাগ করিতে সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিয়াছিলেন।

এই সময় সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রতি তাঁহার শেষ নির্দ্দেশনামা প্রচার করেন। উহা নিম্নরূপ—

আজাদ-হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি—

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আপনারা যেখানে বীরোচিত সংগ্রাম চালাইয়াছেন এবং এখনও চালাইতেছেন, আজ গভীর বেদনার সহিত আমি সেই

ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে ; কিন্তু উহা প্রথম চেষ্টাই মাত্র। আমাদিগকে আরও বহু চেষ্টা করিতে হইবে। আমি চির-আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মানিয়া লইব না। ইম্ফলের সমতলভূমিতে, আরাকানের অরণ্য-অঞ্চলে, ব্রহ্মদেশের তৈলখনি ও অন্যান্য অংশে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকিবে।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আজাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ!

২১শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল

(স্বাঃ) সুভাষচন্দ্র বসু
আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া আসেন ; কিন্তু ভারতীয়গণের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য মেজর-জেনারেল লোকনাথনের অধিনায়কত্বে ছয় হাজার আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্য রাখিয়া এবং সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জে. এন. ভাদুড়ীর উপর সঙ্ঘের সকল দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসা হইয়াছিল।

রেঙ্গুণ ত্যাগের পূর্বেই স্বাধীন-ভারত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের দেনা-পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছিল। জাপানীদের

পশ্চাদপসরণ ও ব্রিটিশ-কর্তৃক পুনরধিকারের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে রেঙ্গুণে একটিও রাহাজানি বা অন্য কোনরূপ বিশৃঙ্খল অরাজক অবস্থা ঘটে নাই।

১৯৪৪ সালের এপ্রিলে রেঙ্গুণে আজাদ-হিন্দ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্ক যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম চালাইতেছিল। ১৯শে মে ব্রিটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ উহা (আজাদ-হিন্দ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক) অধিকার করিয়া বসে। ফিল্ড-সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্ত্তৃপক্ষ ২৮শে মে শ্রীযুক্ত ভাদুড়ীকে গ্রেপ্তার করেন এবং তখন হইতে আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের কার্য্য-কলাপ বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতেই আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের কর্ম্মিগণ ও তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে দলে-দলে গ্রেপ্তার করা হইতে লাগিল।

বর্ত্তমানে আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট বিলুপ্ত হইয়াছে এবং জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে আজাদ-হিন্দ ফৌজকেও আত্ম-সমর্পণ করিতে হইয়াছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজের অনেককেই ভারতে আনিয়া মুক্তিদান করা হইয়াছে। তাঁহাদের কয়েক-জনের বিচার হইতেছে, কাহারও বা বিচার-পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রথম তিন জনের বিচার আরম্ভ হয়। ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ, ক্যাপ্টেন পি. কে. সাইগল ও ক্যাপ্টেন গুরুবক্স সিং ধীলনের বিরুদ্ধে যথারীতি চার্জ্জসিট দাখিল করা হইল এবং অবশেষে

কয়েক সপ্তাহ পরিপূর্ণ উত্তেজনার মধ্যে তাঁহাদের এই বিচার-পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় বাহিনীর নিম্নলিখিত সাত জন অফিসারকে লইয়া সামরিক আদালত গঠিত হইয়াছিল।

(১) মেজর-জেনারেল এ. বি. ব্ল্যাকল্যাণ্ড
(২) ব্রিগেডিয়ার এ. এইচ. হার্ক
(৩) লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল সি. আর. স্কট্
(৪) " টি. আই. ষ্টিভেনসন
(৫) " নাসির আলি খান
(৬) মেজর বি. প্রীতম সিংহ
(৭) " বনোয়ারীলাল

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন অ্যাড-ভোকেট জেনারেল সার এন্. পি. ইঞ্জিনিয়ার ও মেজর ওয়াল্‌স্। সার তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই অভিযুক্তদিগের পক্ষ-সমর্থন করিয়াছিলেন।

দিল্লীর লালকেল্লাকে সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করিয়া তন্মধ্যে সামরিক আদালতের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাইগল ও লেফ্‌টেন্যাণ্ট ধীলন সামরিক আদালতে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। লেফটেন্যাণ্ট ধীলনের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ এবং অপর দুই জনের বিরুদ্ধে নরহত্যার সহায়তার অভিযোগও আনা হয়।

সামরিক আদালত সাব্যস্ত করিলেন যে, তিন জনই

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিযোগে অপরাধী। ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ তদুপরি নরহত্যার সহায়তার অভিযোগেও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন। ক্যাপ্টেন সাইগলকে নরহত্যার সহায়তা ও লেফ্‌টেন্যাণ্ট ধীলনকে নরহত্যার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

বিচারে সামরিক আদালত তাঁহাদের সকলকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তাঁহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার ও তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু সামরিক আদালত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত দণ্ড বা রায় জঙ্গীলাট-কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে কার্য্যকরী হয় না। সুখের বিষয়, জঙ্গীলাট বাহাদুর অফিসারত্রয়ের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ মার্জ্জনা করিয়াছেন; শুধু চাকরী হইতে বরখাস্ত ও ভাতা বাজেয়াপ্তের আদেশই বলবৎ রহিয়াছে

দুঃখের বিষয়, প্রথম বিচার-পর্ব্বের ন্যায় অপর বিচার-পর্ব্বগুলি শাসকবর্গের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্যতম অভিযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রসিদ সাত বৎসর কারাবাসের আদেশে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার এই কঠোর দণ্ডে সমগ্র দেশব্যাপী—হিন্দু-মুসলমান সকলের হৃদয়েই যে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আত্মপ্রকাশ করায় স্থানে-স্থানে অতি চরম পরিণতি ও শোচনীয় দুর্ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দিনের

কঠোর দণ্ডের কথা শুনিয়াও সমগ্র ভারতবর্ষ স্তব্ধ হইয়াছে।

পরাধীন ভারতবর্ষের এক বাঙ্গালী অধিবাসীর সম্পর্কে অন্যান্য স্বাধীন দেশের অধিবাসীরাও যে কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ জাপানী সাংবাদিক মিঃ হাগিওয়ারার বিবৃতি পাঠ করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ইউনাইটেড প্রেস্ অভ্ আমেরিকার প্রতিনিধির নিকট তিনি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ম্যানিলায় এক সাংবাদিক-সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার নিজের ও গান্ধীর মতবাদকে একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার স্বতন্ত্র পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; বসু এ-কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন, সামরিক কার্য-কলাপ, তাঁহার সহকর্মী এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যতা সঞ্চার করিবে ও তাহাদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করিবে। তাঁহার প্রচেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হইতে পারে এবং ব্যর্থতার নৈরাশ্যে শোচনীয় ভাবে হয়ত তাঁহাকে মরিতে হইতে পারে, কিন্তু তবুও তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের চরম সাফল্যের জন্য সশস্ত্র শক্তি-প্রয়োগ আবশ্যক।

মিঃ হাগিওয়ারা বলিয়াছেন, "চারিবার আমি পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক-সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়াছি—রেঙ্গুনে, ব্যাঙ্ককে, সিঙ্গাপুরে ও ম্যানিলায়। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী।"

স্বয়ং হিট্‌লার পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বীরের মর্য্যাদা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার সৈন্য-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মনে রাখিও আমি এক ক্ষুদ্র দেশের 'ফ্যুরার' বা অধিনায়ক, কিন্তু তিনি এক বিশাল দেশের 'ফ্যুরার'। সুতরাং তাঁহাকে তদ্রূপ সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করিও না।"

এস্থলে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রাচ্য রণাঙ্গনে এসিয়া মহাদেশে যখন শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ও ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তিকামী একদল আজাদ-হিন্দ ফৌজ গড়িয়া উঠিতেছিল, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যে ইয়োরোপের রণাঙ্গনেও তখন অপর একদল আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণগণ তাহাদিগকে "ফ্রী ইণ্ডিয়ান" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্য হইতেই এই মুক্তিকামী সৈন্যদল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল ৩৫০০ এবং ১৫টি কোম্পানীতে বিভক্ত ছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টকে সুস্পষ্ট ভাবে এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, আজাদ-হিন্দ ফৌজকে যেন কেবল ইংরেজ ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত করা হয়, রুশ বা অপর কোন জাতির বিরুদ্ধে যেন তাহাদিগকে ব্যবহার করা না হয়। নেতাজীর এই নির্দ্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রথম বিচার-পর্বের পূর্ব পর্য্যন্ত স্বদেশে ও বিদেশে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে হয় তো বা একটা বিরুদ্ধ অভিমত বর্ত্তমান ছিল! তখন পর্য্যন্ত কেহ হয় তো মনে করিতেন, সুভাষচন্দ্র এক শত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য অপর এক বিদেশী শত্রুকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছিলেন; সুতরাং জয়চাঁদের সঙ্গেই তিনি তুলনীয়, এবং তাঁহার সৈন্য-বাহিনী বিভীষণ-বাহিনী ছাড়া আর কিছুই নহে। সুখের বিষয়, ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাহগল ও লেফ্‌টেন্যাণ্ট ধীলনের বিচারকালেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ একেবারেই জাপানের তাঁবেদার ছিল না,—এবং সেইজন্য সুভাষচন্দ্রকে জাপানীদের সঙ্গে অবিরতই দৃঢ় ভাবে ও সুকৌশলে দ্বন্দ্ব করিতে হইয়াছে। সুতরাং আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচারে এইটুকুই দেশবাসীর লাভ।

সমগ্র জগৎ আজ বুঝিয়া লইয়াছে, সুভাষচন্দ্রের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। পলায়নের অপমান-পঙ্কিল কালিমার মধ্য হইতে তিনি যে বিজয়-গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই অনুভূতি আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, জরাজীর্ণ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন-জলুষে মহিমোজ্জ্বল করিয়া তাহার লাঞ্ছিত নত মস্তকে তারুণ্যের কিরীট পরাইয়া দিয়াছে!

আট

বজ্রপাত

নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ— বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দুঃখের বিষয়, সমগ্র গৌরবের যিনি অধিকারী,—না জানি তিনি আজ কোথায়! জীবিত কি মৃত, এই প্রশ্ন সকলেরই বুকে আজ খুব বড় আকারে দেখা দিয়াছে! এই অশুভ প্রশ্নের একমাত্র কারণ, বিগত ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট জাপানী নিউজ এজেন্সী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসেও অনুরূপ এক গুজব রটিয়াছিল তখন প্রকাশ হইয়াছিল যে, 'স্বাধীন-ভারত কংগ্রেসে' যোগদানের জন্য টোকিও যাইবার পথে সুভাষচন্দ্র বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীও এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজনের নিকট সমবেদনা-পূর্ণ এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে যখন প্রতিপন্ন হইল যে এই সংবাদ মিথ্যা, তখন মহাত্মা তাঁহার বাণী প্রত্যাহার করেন; কিন্তু এইবার আর জাপানী নিউজ এজেন্সীর সংবাদ সঠিক ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে না, দেশবাসীর পক্ষে ইহাই পরম বেদনার বিষয়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তারিখে জাপানী নিউজ এজেন্সী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়াছেন।

তিনি আকাশ-যান দুর্ঘটনায় আহত হইয়া এক জাপানী হাসপাতালে মারা গিয়াছেন বলিয়া জাপানী নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছে।

জাপ-গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিবার জন্য অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তা সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৫ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে বিমানযোগে সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাত্রা করেন; ১৮ই আগষ্ট বেলা ২টার সময় তাই-হোকু বিমানক্ষেত্রে তাঁহার বিমানখানি এক দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনি গুরুতররূপে আহত হন। এক জাপানী হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসা হয়—কিন্তু সেখানে মধ্যরাত্রেই তিনি মারা যান। লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সুনামাসা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর এডজুটাণ্ট কর্ণেল হবিবর রহমান ও অপর চারি জন জাপানী অফিসার দুর্ঘটনার ফলে আহত হন।

জাপানী সূত্রে সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদে ইতঃপূর্ব্বে জানা গিয়াছিল, জাপানীদের রেঙ্গুণ পরিত্যাগের শেষ দিনে তিনি রেঙ্গুণ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হয়।

কিন্তু এখনও বহুলোক তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করেন না। নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির সভায় যে সমস্ত বিশিষ্ট নর-নারী গত অধিবেশনের পর পরলোক গমন করিয়াছেন, শোক-প্রকাশের জন্য তাঁহাদের নামের দীর্ঘ তালিকার মধ্যেও সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ছিল না। ইহা দেখিয়া জনৈক সদস্য ঐ

বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সভাপতি বলেন—"সুভাষবাবুর নাম অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ এই যে, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ এখনও নিশ্চিতরূপে সমর্থিত হয় নাই। প্রকৃত সংবাদের অভাবে কাহারও মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা ভাল দেখায় না।"

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাহারও মৃত্যু-সংবাদে পরম শত্রুও মিত্ররূপ ধারণ করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করে। মৃত্যুর হস্তস্পর্শে সমস্ত বিদ্বেষ ও শত্রুতা, বিভেদ ও কলহ—কোথায় দূরে সরিয়া যায়! দুর্ব্বল মানব-প্রাণ মৃত ব্যক্তির মঙ্গল-লাভের জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। এইটি চিরন্তন সত্য!

সুভাষচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন; আজ তাঁহার জন্যও সমগ্র দেশ শোকে অভিভূত!

তাঁহার মৃত্যুতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেনঃ—"আমি আমার এই পুরাতন এবং সাহসী সহ-কর্ম্মীর মৃত্যু-সংবাদে স্তম্ভিত হইয়াছি। ভারতের প্রতি তাঁহার ভালবাসা কাহারও অপেক্ষা কম নহে ভারতের এই মহৎ সন্তানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ আমার ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল. ভারতের প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা এবং উদ্দেশ্যের সাধুতা সন্দেহের অতীত."

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেনঃ—"ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর সন্তান এবং দেশহিতব্রতীদের অগ্রণী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘটনাবহুল জীবনের আকস্মিক অবসানে সমগ্র দেশ গভীর

শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য উৎসর্গ করেন নাই।"

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলিয়াছেন :—"সুভাষ মৃত ; বহুবর্ণে চিত্রিত, অদ্ভুত এবং ঘটনাবহুল জীবন-নাট্যের শেষ বিয়োগান্ত দৃশ্য অভিনীত হইয়া গেল! বহু নর-নারীর নিকট তাঁহার মৃত্যু জাতীয় ক্ষতি নহে, পরন্তু ব্যক্তিগত শোকাবহ ঘটনা! তাঁহার উদগ্র গর্বিত এবং প্রবল মনোবৃত্তি কোষমুক্ত জ্বলন্ত তরবারির মত দেশরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। তাঁহার জীবন ও মৃত্যু স্বাধীনতার বেদীমূলে বলিদান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তিনি তাঁহার দেশ ও দেশের লোকের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা মহত্তর ভালবাসা আর কিছুই হইতে পারে না।"

পট্টভি সীতারামিয়া বলিয়াছেন :—"সুভাষ বাবুর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। ভারতের মুক্তির জন্য তিনি নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইয়াছিলেন ; তজ্জন্য তিনি তাঁহার কংগ্রেস-সহকর্ম্মিগণের নিকট কম প্রিয় নহেন! যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল ছিলেন। যদি তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে সেই ব্যাকুলতা দেশব্যাপী দুঃখ-বন্যায় ভাসাইয়া যাইবে! যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতির্ম্মণ্ডল গভীর ও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিবে।"

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন :—"তাঁহার মৃত্যু দেশের পক্ষে একটি বিরাট দুর্ঘটনা। তাঁহার মত লোক কদাচিৎ

জন্মগ্রহণ করেন এবং যখন তাঁহারা চলিয়া যান, তখন সেই শূন্যস্থান সহজে পূর্ণ হয় না।"

খাঁ আবদুল গফুর খাঁ বলিয়াছেন:—"আমার পুরাতন সহকর্মী মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে আমি শোকাহত হইয়াছি। আমরা উভয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে একসঙ্গে কাজ করিয়াছি এবং তিনি ভারতের মঙ্গল এবং উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি।"

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন:—"সত্যই যদি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে এই সংবাদ ভারতের সর্বত্র গভীর দুঃখের সহিত গৃহীত হইবে। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

এস. কে. পাটিল বলিয়াছেন:—"এই মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র দেশে শোকচ্ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুর্ঘটনার মধ্যে আমাদের বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ দেশ-সেবকের ঝটিকাময় জীবনের অবসান হইল। তিনি তাঁহার জীবনে যাহা কিছু করিয়াছেন, সবই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া করিয়াছেন।"

কিরণশঙ্কর রায় বলিয়াছেন:—"এখন তিনি (সুভাষচন্দ্র) ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। তথাপি ভারতের প্রত্যেক গৃহে গভীর দুঃখ এবং শোকের ছায়া নিপতিত হইবে।"

স্বামী সহজানন্দ বলিয়াছেন:—"সুভাষচন্দ্রের অকাল-মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমি গভীর ভাবে শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি। দীর্ঘকাল ব্যাপী তাঁহার সাহচর্যে আমার বিশ্বাস

হইয়াছে যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক। তাঁহার সমগ্র জীবন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য কঠোর ত্যাগের নিদর্শন।"

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলিয়াছেন :—"বৈদেশিক শাসন হইতে মাতৃভূমিকে মুক্তিদানের জন্য মনোবৃত্তি দ্বারা সুভাষচন্দ্র গঠিত ছিলেন। এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবেন।"

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন :— "দুর্ঘটনার ফলে সুভাষচন্দ্র [illegible] দেশের [illegible] [illegible] করিলেন। তাহার দুঃসাহসিক মনোবৃত্তি এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য অবিচল অনুরাগে তিনি [illegible] যোগ করিয়াছিলেন এবং উহাই তাঁহাকে দেশের [illegible] শ্রেষ্ঠ বীররূপে পরিগণিত করিয়াছে।"

[illegible] মাষ্টার বলিয়াছেন :—"সুভাষচন্দ্র নিজের উন্নতিময় জীবন পরিহার করিয়া দেশের স্বাধীনতার কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাহার মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র জাতি শোক-সাগরে নিমগ্ন। যে উদ্দেশ্যে তিনি আত্মবিসর্জন দিয়াছেন, একদিন তাহা জয়যুক্ত হইবে এবং দেশবাসী তাঁহার গৌরবময় আত্মত্যাগের মূল্য দিতে শিখিবে।"

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস বলিয়াছেন :—"আমি স্বদেশ-প্রেমিক আত্মার শোচনীয় পরিণামে শোক প্রকাশ করিতেছি।

তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমে তাঁহার প্রতি আমাদের বরাবর একটা শ্রদ্ধা ছিল। বসু-পরিবার অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন ; আমি তাঁহাদের এই ক্ষতিতে আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত বলিয়াছেন :—"ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক সন্তান সুভাষচন্দ্র বসুর এইরূপ আকস্মিক ভাবে মৃত্যুর সংবাদে আমরা এরূপ শোকাভিভূত হইয়াছি যে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ সুকঠিন। এইরূপ মৃত্যু বাস্তবিক শোকাবহ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে।

ডক্টর পি. এন্. ব্যানার্জ্জি বলিয়াছেন :— সমগ্র দেশ মাতৃভূমির অনুরক্ত সেবকের বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তিতে শোক প্রকাশ করিবে।"

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব্ বলিয়াছেন :—"মিঃ বসুর মৃত্যুতে সমগ্র ভারত শোক প্রকাশ করিবে। তাঁহার আত্মত্যাগ, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ, তাঁহার অসামান্য সঙ্ঘ-গঠনশক্তি—এই সমস্ত দেশের যুবকগণের সম্মুখে চিরকাল আদর্শ-স্বরূপ অবস্থিতি করিবে।"

অধ্যাপক এন্. জি. রঙ্গ বলিয়াছেন :—"ভারতে যে সমস্ত বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুভাষ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সাহস এবং অধ্যবসায় তাঁহার মহত্ত্বের প্রমাণ।"

পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন বলিয়াছেন:—"সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের জন্মভূমি তাঁহার শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানকে হারাইলেন।"

অনুগ্রহ-নারায়ণ সিংহ বলিয়াছেন:—"দেশের প্রতি সুভাষচন্দ্র বসুর ভালবাসা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার অসীম উদ্যমের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে: ভবিষ্যৎ বংশধরগণ বিস্ময়-পরিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী ও তাঁহার স্বদেশপ্রেমের বিবরণ পাঠ করিবে, সন্দেহ নাই।"

প্রতাপচন্দ্র গুহরায় বলিয়াছেন:—"সমগ্র দেশ সুভাষ-চন্দ্রের অকাল-মৃত্যু-সংবাদে শোকাহত হইয়াছে। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। ভারতের স্বাধীনতার জন্য জ্বলন্ত ইচ্ছা লইয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।"

জগৎনারায়ণ লাল বলিয়াছেন:—"তাঁহার কঠোর দেশ-সেবা, মহৎ আদর্শবাদ, সর্ব্বোপরি আত্মোৎসর্গ ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকিবে।"

নয়

সুভাষ-স্মরণে

সুভাষ-দিবস—সুভাষ-জন্মোৎসব—স্বাধীনতা-দিবস—মেজর-জেনারেল শা নওয়াজের কলিকাতায় আগমন—ভাবের বন্যা।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'সুভাষ-দিবস' প্রতিপালিত হইয়াছে। বোম্বাই প্রথমে 'সুভাষ-দিবস' প্রতিপালনে অগ্রণী হইয়াছিল।

সেদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল। জি. আই. পি. রেলওয়ের কারখানায় যে সমস্ত কর্ম্মচারী সকালবেলা কাজ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা কাজ না করিয়াই গৃহে ফিরিয়া গেল। ছয়টি মিল বন্ধ ছিল, শহরের বাজারও বন্ধ ছিল।

২৪শে আগস্ট তারিখে কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট-স্থিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কর্ম্মিদলের অ্যাসোসিয়েশন-গৃহে 'হাফ-মাস্ট' করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইল। সেদিন বহু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ক্লাসে যোগদান করে নাই, বড় বাজার ও কলেজ ষ্ট্রীটে দোকান-পাট বন্ধ ছিল। অপরাহ্নে বহু ছাত্র রাস্তায় জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে-করিতে শোভা-যাত্রা করিয়াছিল।

'ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যালিষ্ট ষ্টুডেণ্টস্ ব্যুরো'-অফিসে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল প্রভিন্স্যাল মারোয়াড়ী ফেডারেশন অফিস বন্ধ করা হয়। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণ ক্লাস

হইতে বাহির হইয়া আসে এবং ২৫শে আগষ্ট তারিখে শোক-সভায় 'সুভাষ-দিবস' প্রতিপালন করে। যাদবপুর কলেজ অফ এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজির ছাত্র ও শিক্ষকগণ সম্মিলিত ভাবে এক সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, সুরাট, পুণা সিটি, কাণপুর, আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, পাটনা, লাহোর, নাগপুর, ওয়ার্দ্ধা, কটক, জব্বলপুর, শান্তি-নিকেতন, ব্যাঙ্গালোর, সিমলা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ছাত্রগণ সুভাষ-দিবস প্রতিপালন করিয়াছে। বহু স্থানে পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নানা স্থানে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয় ও শোভাযাত্রা করিয়া সকলে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

ইহার কয়েক মাস পরে, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শা নওয়াজ খাঁর কলিকাতায় আগমন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে, কলিকাতা মহানগরীর বুকে আনন্দের যে বিপুল উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল, সমগ্র পৃথিবীতেই তাহার তুলনা বিরল।

শা নওয়াজ খাঁ কলিকাতায় আসেন ২২শে জানুয়ারী; ২৩শে জানুয়ারী ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব-দিবস; এবং ২৬শে জানুয়ারী ছিল ভারতের স্বাধীনতা-দিবস।

এই কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র মহানগরী সেদিন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। নেতাজীর বিশ্বস্ত অনুচর, পরম ভক্ত ও দুর্দ্ধর্ষ বীর শা নওয়াজ খাঁ কলিকাতায়

পদার্পণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে নেতাজীর গৃহে উপস্থিত হইলেন; তারপর নেতাজীর ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি যে দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজও তাহা মনে হইলে নয়ন-যুগল হইতে যেন গঙ্গা-যমুনার পুণ্য-প্রবাহ নামিয়া আসে!

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয় তাঁহার অমর লেখনী-নিঃসৃত স্বর্ণাক্ষরে তাহা যে ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাহারই সামান্য কিছু অংশমাত্র পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।—

"সেই কক্ষ। এই কক্ষ-সন্নিধানে সেদিনও জনতা জমিত, আজও জনতা অপেক্ষমান! কেদারার উপরে সুভাষের সেই ছবিখানি!

শা নওয়াজ খাঁ ভদ্র ও ভাল মানুষটির মত সিঁড়ি দিয়া উঠিলেন, তারপর গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই ছবি—তাঁহার নেতাজীর সেই ছবিখানি সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, সে কি বালকের কান্না! সেকি নারীর ক্রন্দন! কোথায় ছিল এত জল? পাষাণের তলে সাগরের উচ্ছ্বাস কত দিন ছিল, লুকানো; কতকাল ছিল, গোপনে? অবরোধে? কে উন্মুক্ত করিয়া দিল অশ্রুর উৎস?

সুভাষের সেই শয্যা! শা নওয়াজ খাঁ খাটের নীচে জানু পাতিয়া শয্যায় মুখ লুকাইলেন; চোখের জলে চাদর ভিজিল; উপাধান সিক্ত হইল।—

মেজর-জেনারেল শা নওয়াজ তখনও চাদরে মুখ ঘসিতেছেন, আর অতি মৃদু, অতি ধীর, অপরাধীর কণ্ঠে

বলিতেছেন, "নেতাজী, আমি পারি নাই; নেতাজী, আমি পারি নাই (I have failed! I have failed)! নেতাজী, আমায় ক্ষমা করুন, আমি পারি নাই, আমি পারি নাই!"

নেতাজীর নিকট শা নওয়াজ খাঁ ও সমগ্র আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ একদিন স্বাধীনতার যে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহারই ব্যর্থতা স্মরণ করিয়া, কত ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান-বিজয়ী মেজর-জেনারেল শা নওয়াজ খাঁর বীর-হৃদয় সেদিন গভীর দুঃখে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছিল!

এ দৃশ্য বর্ণনার নহে, এ দৃশ্য অনুভূতির।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে কি ছিলেন এবং কে ছিলেন, এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তেই তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

দশ

ব্যক্তিত্ব

সর্ব্বত্যাগী—তেজস্বী—বাগ্মী—পরদুঃখকাতর—বন্ধুবৎসল
—অতুলন স্বদেশপ্রেম—অসাম্প্রদায়িক—চির-অমর।

সুভাষচন্দ্রের নৈতিক চরিত্রে কখনও কোন কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই। তিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লইয়া চির-ব্রহ্মচারীর মত পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র দেশ-সেবার জন্য যে স্বার্থত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রাচীন যুগে ভীষ্ম এবং ঐতিহাসিক যুগে রাণা প্রতাপের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সাধারণ বাঙালী জীবনের ভোগ-সুখে কালাতিপাত করিতে পারিতেন। নবীন যৌবন, সুন্দর-সৌম্য আকৃতি, পাণ্ডিত্য, অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ-সুবিধা—তিনি সমস্তই দেশ-মাতৃকার হোমানলে আহুতি দিলেন।

তাঁহার এই ত্যাগের কথা পর্যালোচনা করিলে রঘুবংশে মহারাজ দিলীপের প্রতি সিংহের উক্তি মনে পড়ে—

> "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বম্
> নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।
> অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্
> বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্॥"

সিংহ যেমন মহারাজ দিলীপকে "বিচারমূঢ়" বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিল, সাধারণ লোকও হয়ত সুভাষচন্দ্রকে ঠিক

সেইরূপ মনে করিবে। কিন্তু মহৎ যাঁহার উদ্দেশ্য, ক্ষুদ্রে তাঁহার তৃপ্তি কোথায় ? "নাল্পে সুখমস্তি।"

সেইজন্য মহামানবেরা আত্মসুখের প্রয়াসী হইতে পারেন না—সুভাষচন্দ্রও পারেন নাই। আই. সি. এস্. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াও তিনি দাস-মনোবৃত্তির বশীভূত হইতে পারিলেন না—হেলায় আই. সি. এস.-পদ পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করতঃ কারাবাস ও নির্ব্বাসনের দুঃখ-কষ্ট মাথায় তুলিয়া লইলেন।

সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের মহৎ গুণ তেজস্বিতা। জীবনের প্রথমভাগে প্রেসিডেন্সী কলেজে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী জীবনে তাহাই কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর আপোষ-মীমাংসাকে অসার মনে করিয়া মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণেও কুণ্ঠিত হয় নাই এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করিয়া ভারতীয় জাতীয় বাহিনী পরিচালনায় দাবানলের সৃষ্টি করে।

বক্তৃতা দ্বারা লোককে মুগ্ধ করিবার অসামান্য শক্তি সুভাষচন্দ্রের ছিল। সহজ ও সরল ভাষায় তাঁহার মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই সাক্ষ্য দান করিবেন যে, এমন বক্তৃতা করিবার শক্তি খুব কম লোকেরই থাকে।

পরদুঃখে সুভাষচন্দ্রের কোমল হৃদয় কাঁদিয়া আকুল হইত। বহু বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর সেবায় তাঁহার এই চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধকালেও তাঁহার গভীর ভালবাসা ও স্নেহ-প্রবণ হৃদয় বহুবার আত্মবিকাশ করিয়াছে।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্তর্গত ঝান্সীর রাণী-বাহিনীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা ছিলেন শ্রীযুক্তা চন্দ্রমুখী দেবী। তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর।

ইনি আজাদ-হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া নার্সের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে ছিলেন। ইনি আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং এমন কি, সমরক্ষেত্রের কয়েকটি হাসপাতালেও কাজ করিয়াছেন। ইনি ঝান্সীর রাণী-বাহিনীতে সিপাহীর পদে ছিলেন। ইঁহার তিনটি পৌত্র বালসেনা-দলে যোগদান করিয়াছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের সকলেই তাঁহাকে 'মাতাজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

'মাতাজী' আনন্দবাজার পত্রিকায় ষ্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার ফৌজের লোকদের কিরূপ গভীরভাবে ভালবাসিতেন এবং তাহাদের সেবার জন্য দারুণ বোমাবর্ষণের মধ্যেও কয়েক বার কিরূপভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবাবেগে বর্ণনা করিয়াছেন।

এরূপ ধরণের একটি দৃষ্টান্ত—যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—বর্ণনা-প্রসঙ্গে মাতাজী বলেন যে, ব্রহ্ম-রণাঙ্গনে যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে ব্রিটিশরা একবার রেঙ্গুণে মিয়ান হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণ করে। ইহা কতকটা কার্পেট-বোম্বিংয়ের ন্যায় হইয়াছিল; দুই বর্গ-মাইল স্থান জুড়িয়া বোমা বর্ষিত হয়। ঐ হাসপাতালের অতি নিকটেই মাতাজীর বাসগৃহ ছিল। শত-শত নাগরিক এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজ এই বোমাবর্ষণের ফলে আহত হয়। নেতাজী আহতদের দেখিবার জন্য ছুটিয়া যান।

এই সময় মাথার উপর আবার একদল বোমারু বিমান দেখা দেয় এবং ঐগুলি বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। নেতাজীর গাড়ীটি একটি বোমার আঘাতে নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু নেতাজী তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া হাঁটিয়াই ঐ হাস-

পাতাল অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে আহতগণ দারুণ বিপদের মধ্যেও উল্লসিত হইয়া উঠেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই মধুর চরিত্রের জন্য আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকটি সৈন্যও তাহাকে গভীরভাবে ভাল-বাসিত এবং তাঁহার শিক্ষা সকলে অন্তরের সহিত মানিত ও তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। লেঃ কর্ণেল চাটার্জ্জি তাহার একটি উদাহরণ দিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, "ইম্ফল হইতে ফিরিবার সময় সৈন্য-দিগকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। এক জায়গায় একটি লোক মরণোন্মুখ হয়। ভাগ্যক্রমে তাহার ভাই তাহার কাছে আসে। অবস্থা দেখিয়া ভাই কাঁদিতে থাকে। তখন সে যোদ্ধা তাহার ভাইকে বলিল—'তুমি কর্ত্তব্যহারা হইও না, আমার জন্য কাঁদিতেছ কেন? আমার দুঃখ হয় এইজন্য যে নিজের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিলাম না! তুমি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দাও যতদিন বাঁচিবে, ততদিন আমার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। নেতাজীকে বলিও—আমি আমার প্রাণ এখানে দিলাম কিন্তু বাসনা রহিয়া গেল—তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলাম না!'—"

সুভাষচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী, যদিও তাহা কেবল দেশের স্বাধীনতা-লাভের উপায়-উদ্ভাবনেই নিরত ছিল। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল স্বদেশী লীগ' দ্বারা তিনি দেশের অর্থনীতিক উন্নতির বিষয়েও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দর্শনের ছাত্র হিসাবে জগৎকে নূতন কোন মতবাদ প্রদান করাও হয়ত তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না; কিন্তু যে দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চায় তাঁহার জীবন আরম্ভ, সেই বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার অবকাশ তিনি পান নাই—নতুবা আজ পৃথিবী হয়ত সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কাণ্ট, হেগেল,

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতেও জীবনের ব্যাখ্যায় কোন নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারিত।

সুভাষচন্দ্রের রহস্যজনক অন্তর্দ্ধানে তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল-যুগে আওরঙ্গজেবের রাজধানী দিল্লী হইতে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর পলায়নের মত সুভাষচন্দ্রের পলায়নও অভিনব কৌশলের পরিচায়ক।

সর্ব্বোপরি সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম অতুলনীয়। তাঁহার অতি বড় শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে অবিরাম-গতিতে জল-প্রপাতের বারিরাশির মত উদ্দামবেগে ছুটিয়া চলিত—কোন-রূপ বাধাবিঘ্ন মানিত না। দেশের পরাধীনতায় তাঁহার অন্তরলোকে যে বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হইত, তাহাই তাঁহাকে অগ্নি-দগ্ধ ধধূপের মত সুদূরের পথে লইয়া গিয়াছিল!

ফিলিপাইনের স্বাধীনতা-শহীদ জোস্ রিজলের মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে সুভাষচন্দ্রের মাল্যদানের যে মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ সাংবাদিক হাসিওয়ারার বিবৃতি হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিম্নে প্রদত্ত সেই বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, পরাধীনতার মর্ম্মজ্বালা তাঁহার প্রাণে ছিল কত গভীর—আর যাঁহারা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিতে যাইয়া স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও সুভাষচন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে কি বিপুল পরিমাণে শ্রদ্ধা সঞ্চিত ছিল! স্বদেশপ্রেমের সাধক সুভাষচন্দ্রের ইহা এক সবাক্ উজ্জ্বল চিত্র!

"১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাস। চমৎকার একটি দিন—ম্যানিলার সমুদ্রোপকূলে লুনেটা পার্কে সুভাষচন্দ্র গেলেন

জোস্ রিজলের মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে মাল্যদান করিতে। এই মূর্ত্তিটি খুবই প্রসিদ্ধ, কেননা জোস্ রিজল ছিলেন ফিলিপাইনের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং মুক্তি-সংগ্রামের শহীদ।

মূর্ত্তির পাদদেশে শত-শত ভারতীয়ের এক বিরাট জনতা সুভাষচন্দ্রকে ঘিরিয়া ধরিল। ইহারা সবাই থাকে ম্যানিলা কিংবা তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে। জনতা 'জয়-হিন্দ' ধ্বনিতে বসুকে জানাইল তাহাদের অভিনন্দন। ফটোগ্রাফাররা ফটো তুলিবে—বসু দাঁড়াইলেন জনতার সঙ্গে।

ফটো লওয়া শেষ হইল. বহুক্ষণ কাটিয়া গেল; তিনি নড়েন না. জনতাও নিস্তব্ধ—গভীর নীরবতার মধ্যে মৌন, অচঞ্চল দৃষ্টিতে রিজলের মূর্ত্তির দিকে সুভাষচন্দ্র তাকাইয়া রহিলেন।

স্বাধীন ভারতের প্রতীক অঙ্কিত আজাদ-হিন্দ পতাকা প্রভাত-সমীরণে ইতস্ততঃ আন্দোলিত, বিরাট মূর্ত্তির পাদদেশে সুভাষচন্দ্রের অর্পিত ফুলের রাশি—এক কথায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি উৎসবের রূপ ধারণ করিয়াছিল। সাগ্রহে প্রতীক্ষমাণ নীরব জনতার সম্মুখে তিনি সতৃষ্ণ নয়নে মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

এইরূপ ঘটনায় কেহ-কেহ হয়ত সুভাষচন্দ্রকে ভাবপ্রবণ বলিয়া মনে করিবেন; কিন্তু তাঁহার সহিত কখনও যদি কাহারও আলাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইরূপ ধারণা হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। পক্ষান্তরে, আমার বহু সহকর্ম্মী আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার শান্ত সমাহিতভাব এবং গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সাংবাদিক-সম্মেলনে তাঁহার আচরণ ধীর-স্থির অথচ অতীব দৃঢ়। তিনি কদাচিৎ হাসিতেন, কিন্তু হাসিলে মৃদু ও মধুর হাসি হাসিতেন। আমার মনে হয় যে, হৃদয়াবেগ ও ন্যায়যুক্তির মধ্যে তিনি অবিচলিত সাম্য রক্ষা করিতেন।"

বিদেশে ভারতীয়দিগের হৃদয় সুভাষচন্দ্রের প্রতি কি পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা জববলপুর ক্যাম্প-জেল হইতে সগুমুক্ত সাতজন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈনিক, এলাহাবাদের বাদসাহীমণ্ডী কংগ্রেস-কমিটীর সম্বর্দ্ধনা-সভায় বিগত ৫ই নভেম্বর (১৯৪৫) সন্ধ্যাকালে বিবৃতিদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।

তাঁহারা বলিয়াছেন, সুভাষচন্দ্রকে স্বর্ণ-পরিমাপে ওজন করা হইয়াছিল। এই স্বর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ব্যাঙ্কের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, বিদেশে সুভাষচন্দ্র এত গভীর সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গলদেশের একটি সামান্য পুষ্পমাল্যও জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয়ে, বারো লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন! আর কোন এক বক্তৃতা-সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পাদমূলে যে ভক্তির অর্ঘ্য পড়িয়াছিল, তাহার মূল্য সামান্য দু' একশত টাকা নহে—তাহার মূল্য আট কোটি টাকা!

দিল্লীর সামরিক আদালতে ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ প্রভৃতির বিচারকালে সুভাষচন্দ্রের কতকগুলি টেলিগ্রাম প্রামাণ্য দলিলরূপে গৃহীত হইয়াছিল। সেই সংরক্ষিত টেলিগ্রামগুলিতেও সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়চিত্ততা ও স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৭।১১।৪৫ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উক্ত টেলিগ্রামগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল কইসোকে জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব-এসিয়ার ভারতবাসীরা জাপানের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প।

অন্য একখানি টেলিগ্রামে সুভাষচন্দ্র জাপানী-প্রতিষ্ঠিত

স্বাধীন-ব্রহ্মের শাসনকর্তা ডক্টর বা-ম'কে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রামে সাহায্য-হেতু অভিনন্দিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, যে-কোন অবস্থায় আমরা, ভারতীয়েরা—স্বাধীন-ব্রহ্ম ও জাপানের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, যতক্ষণ না আমাদের সাধারণ শত্রু চূর্ণ হইয়া যায় এবং আমাদের জয়লাভ হয়।

অন্য একখানি টেলিগ্রামে সুভাষচন্দ্র জাপানী বৈদেশিক মন্ত্রী সিগামিৎসুর রাষ্ট্রপরিচালনা-নীতি ও কৌশলের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের পুরোভাগে দুঃসময় সত্ত্বেও আমরা জাপানের পাশে দাঁড়াইয়া আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, যতক্ষণ না বিজয়লাভ করিতে পারি।”

কিন্তু হতভাগ্য দেশ এই ভারতবর্ষ! নতুবা এত বড় একজন আদর্শ নেতা লাভ করিয়াও আমরা তাঁহাকে হারাইয়া বসিয়াছি! গতবারের জনশ্রুতির ন্যায়, এবারও যদি তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ অচিরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবেই যা কিছু আশা ও সান্ত্বনা!

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ অবশ্য অনেকেই বিশ্বাস করেন না; বিভিন্ন জ্যোতিষীর গণনা যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, এখন তাঁহার মৃত্যু হওয়া অসম্ভব! কিন্তু নানা লোকের নানা বিশ্বাস ও মতবাদ, এবং নানা জ্যোতিষীর নানা ভবিষ্যদ্বাণী কি প্রামাণ্য বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকা যায়? কাজেই সুভাষচন্দ্র আমাদের নাই, তাঁহাকে আমরা হারাইয়াছি, আজ এই কথাটাই যেন সত্য হইয়া বড় বেশী বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে!

আশার মধ্যে শুধু এইটুকু যে সম্প্রতি ভারতের নানাস্থান হইতে গুটিকয়েক সংবাদ রটিতেছে কেহ-কেহ নাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ভারতবর্ষেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন! মার্কিণ সাংবাদিকও নাকি

সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে জানাইয়াছেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন, ইহাই নাকি মার্কিণ গোয়েন্দার অভিমত। যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, জানিনা তাঁহাদের সেই ঘোষণার মূল্য কতখানি! সুতরাং আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিভ্রান্ত ও মূহ্যমান! সকলেরই মনে এক প্রশ্ন—সুভাষচন্দ্র জীবিত কি মৃত?

ইহার জবাব দিয়াছেন শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গুণমুগ্ধ সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়। তিনি বলিয়াছেন:—

"সুভাষচন্দ্র জীবিত অথবা লোকান্তরিত, কেহ জানে না! আই. এন. এ.র (Indian National Army—আজাদ-হিন্দ ফৌজ) দৃঢ় বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র জীবিত; সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী মনে করে, পরাধীন ভারতের চির-জাগ্রত আত্মার মত ভারতের মুক্তিকামী সুভাষচন্দ্র মৃত্যুঞ্জয়ী, অবিনশ্বর।

কিন্তু তিনি জীবিত অথবা মৃত, তাহাতে কিছু আসে যায় না। গ্যারিবল্ডি কি মরিয়াছেন? শিবাজী কি মৃত? রাণা প্রতাপসিংহ চিরদিন অমর। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বিনাশ নাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও চিরজীবী।

শুধু ভারতের নয়, শুধু এশিয়ার নয়, পৃথিবীর যেখানে যে দেশে, যে কোন পরাধীন জাতি আছে, সেই খানেই, সেই দেশে, সেই মানব-সমাজের প্রত্যেকটি নরনারী সুভাষচন্দ্রের নামের পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইবে।"

আমরাও তাঁহাকে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে শ্রদ্ধানত শিরে আমাদের প্রণতি জানাইতেছি এবং তাঁহারই প্রদত্ত অমর বাণীতে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ নিবেদন করিতেছি—"জয় হিন্দ! দিল্লী চলো!" কারণ, তাঁহার সেই দিল্লী-অভিযান আজও তো শেষ হয় নাই!

সমাপ্ত